দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

বীর বনবাসী চুড়কা মুর্মুর মাতৃভূমি বন্দনায় জীবন বলিদান — পৃঃ ১৩

চুড়কা মুর্মু 'আত্মনির্ভর' ভারতের প্রতিনিধি দেশ তাঁর জন্য গর্বিত— পৃঃ ১৫

৭৮ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ৩ আগস্ট, ২০২৬।। ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

বীর চুড়কা মুর্মু স্মরণে

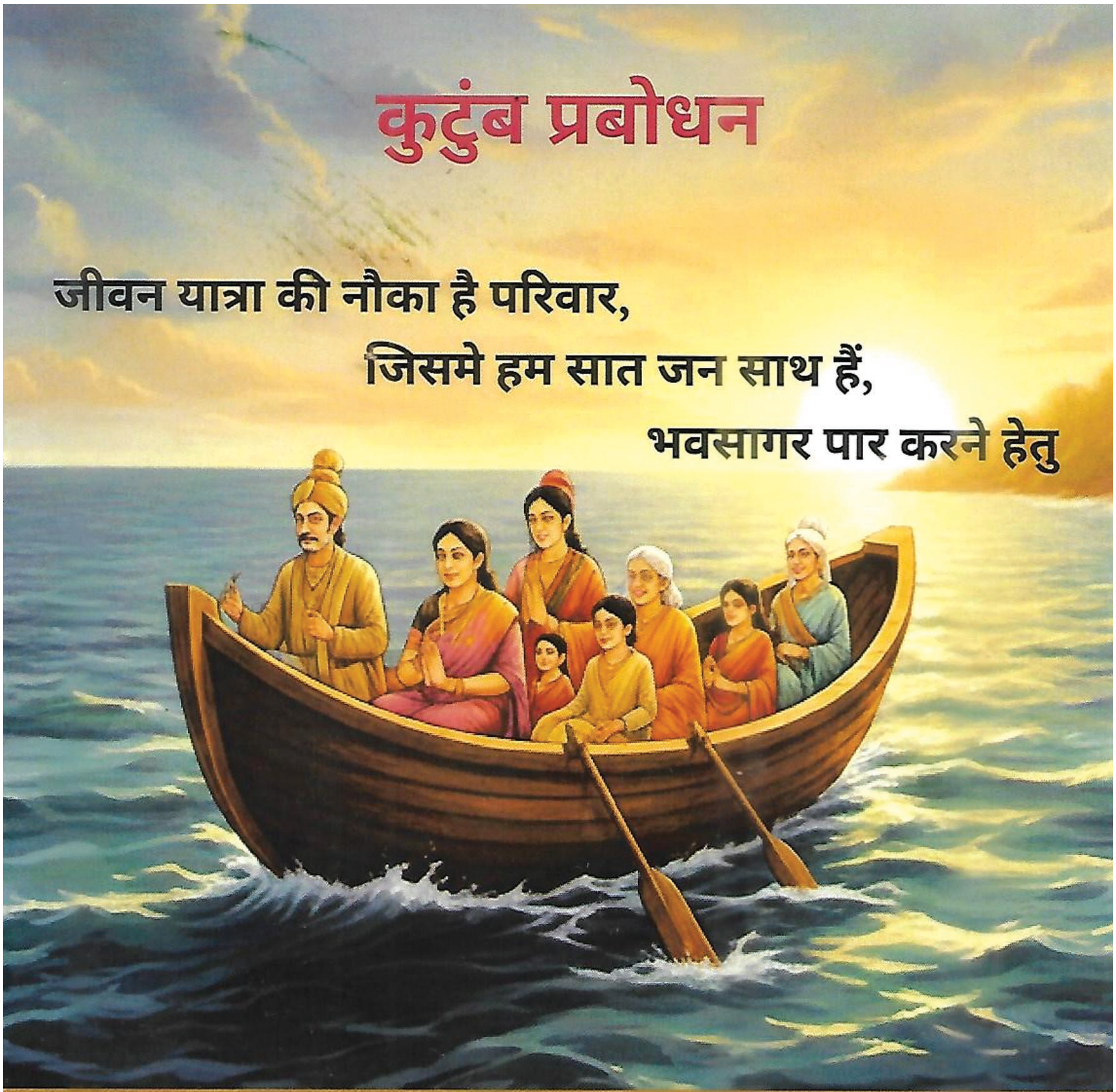

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৩ আগস্ট - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

দাগি নেতা আর দেশদ্রোহীর বিচার বিলম্বিত হলে তা 'বিচার অস্বীকার' হয় : ন্যায়বিচার ও অস্বীকার ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মোদী জাদুকরের খেলা দেখলেন দিদি! ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কী কাণ্ড! সঙ্ঘের বার্থ সার্টিফিকেট নেই! ◻ অভিমন্যু রায় ◻ ৮

নিট প্রশ্ন ফাঁস কীভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়? ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

বাংলাদেশে সরকারের পরিবর্তন হয় ঠিকই, কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১১

বীর বনবাসী চুড়কা মুর্মুর মাতৃভূমি বন্দনায় জীবন বলিদান ◻ শক্তিপদ ঠাকুর ◻ ১৩

জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজজীবনের অভিন্ন অঙ্গ ◻ উত্তম মাহাতো ◻ ১৪

চুড়কা মুর্মু 'আত্মনির্ভর' ভারতের প্রতিনিধি : দেশ তার জন্য গর্বিত ◻ অদ্বৈতচরণ দত্ত ◻ ১৫

দেশ ও ধর্মরক্ষায় বনবাসী সমাজ ◻ শুকদেব টুডু ◻ ১৬

স্বধর্ম ও স্বদেশ রক্ষায় উত্তরবঙ্গের জনজাতি সমাজের অবদান ◻ তরুণ কুমার পণ্ডিত ◻ ১৭

চুড়কা মুর্মু : সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ◻ ১৮

স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ : সনাতন ধর্মচেতনা ও বৈদিক সাধকের জীবন কথা ◻ মানসী দাস ◻ ৩১

শিল্পভাবনা ◻ ডঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ◻ ৩৩

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সত্যের কলমে নীলবিদ্রোহের অগ্নিসাক্ষী ◻ শুভাশীষ পাইন ◻ ৩৪

গ্লোবাল ডিপস্টেট ও ককরোচ জনতা পার্টি : ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট ফাঁস ◻ ডঃ রামানুজ গোস্বামী ◻ ৩৫

চিন্ময় প্রভুর পর বাংলাদেশে আরেক হিন্দুনেতা জেলবন্দি ◻ কানু রঞ্জন দেবনাথ ◻ ৩৬

ব্যক্তির থেকে দল এবং দলের থেকে দেশ বড়ো ◻ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ◻ ৩৭

১৯৭১ : বাঙ্গালি হিন্দুর রক্তে কেনা বাংলাদেশ ইন্দিরা গান্ধীর কৃতিত্ব নাকি প্রতারণা ◻ দীপল বিশ্বাস ◻ ৩৯

রবীন্দ্রসঙ্গমে শ্যামাপ্রসাদ ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৪৩

মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার এক জীবন, এক আদর্শ, এক অনুপ্রেরণা ◻ অরবিন্দ দত্ত ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১০ আগস্ট
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১০ আগস্ট
২০২৬

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস

১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে ভারত এদিন স্বাধীনতা লাভ করে।। কিন্তু তার একদিন আগে দেশমাতৃকা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তাই ১৫ আগস্ট যেমন আনন্দের দিন, তেমনই বেদনারও দিন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় স্বাধীনতা দিবস বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশি বর্ষ পূর্ণ করতে চলেছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হুতাত্মা বীর চুড়কা মুর্মু

জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজজীবনের অভিন্ন অঙ্গ। ইহার উল্লেখ রহিয়াছে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে। প্রাচীন ভারতে জনজাতি সমাজ মূলত শবর, নিষাদ, পুলিন্দ, ভীল প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম রক্ষায় তাহাদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ গুহক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পরম মিত্র ছিলেন। বনবাসকালে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও সীতামাতাকে তিনি ও তাঁহার প্রজাবর্গ সাদরে আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীরাম ও গুহকের প্রেম ও ভক্তির কথা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ভক্তিবিনম্রচিত্তে উত্থাপন করিতেন। রামায়ণে শবরীমাতা ও শ্রীরামচন্দ্রের নিখাদ প্রেম ও ভক্তির কথা সামাজিক সমরসতার এক অনন্য উদাহরণ। মহাভারতে কিরাত, খাসা, পুলিন্দ-সহ বিভিন্ন জনজাতির উল্লেখ রহিয়াছে। এই সব গোষ্ঠী প্রধানত সীমান্ত, বনজঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করিত। তাহারা যোদ্ধাজাতি হিসাবে পরিচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই জনজাতি যোদ্ধারা পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভীল জনজাতির লোকেরা বাস করেন। মহারাণা প্রতাপ ও ভীল জনজাতির মানুষের গভীর সম্প্রীতির কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মুঘল শাসক আকবরের বিরুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের প্রধান শক্তি ছিলেন ভীল যোদ্ধারা। ভীল সর্দার রাণা পুঞ্জা এবং তাঁহার তিরন্দাজি বাহিনী মহারাণা প্রতাপকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ভীল সেনাপতি পুঞ্জাকে তাঁহার বীরত্বের কারণে মহারাণা প্রতাপ স্বীয় রাজ উপাধি 'রাণা' সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপ মেবারের রাজকীয় প্রতীকে রাজপুত বীরগণের পাশাপাশি ভীল যোদ্ধাদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সামাজিক সমরসতার অমর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

আধুনিককালেও দেশ, জাতি, সমাজ ও ধর্ম রক্ষায় জনজাতি সমাজের আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহা অত্যন্ত গৌরবময় ও অবিস্মরণীয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনজাতি বীর ভ্রাতৃদ্বয় সিধু-কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং তাহাদের আত্মত্যাগের কথা; ভগবান বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে ইংরাজ শাসকের অত্যাচার এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; দক্ষিণ ভারতে অল্লুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে রামপা বিদ্রোহ; উত্তর-পূর্ব ভারতে রানিমা গাইদিনল্যুর ইংরাজ শাসন বিরোধী সংগ্রাম; বুদ্ধ ভগত ও জোয়া ভগতের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ওড়িশা ও ছোটোনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনজাতি সমাজের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে শক্তি প্রদান করিয়াছিল। সমগ্র ভারত এই জনজাতি সমাজের আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, জনজাতি সমাজের সর্বপ্রকার উত্থানের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে।

জনজাতি সমাজের শত শত যোদ্ধা যাঁহারা দেশ, জাতি ও ধর্ম রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত হুতাত্মা চুড়কা মুর্মুর নাম সংযোজিত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রারম্ভে অধুনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্তবর্তী চকরামপ্রসাদ গ্রামের জনজাতি যুবক চুড়কা মুর্মু দেশ রক্ষার্থে আত্মাহুতি দিয়াছেন। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চুড়কা মুর্মুর প্রাণোৎসর্গের কথা সমগ্র দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। উল্লেখ্য, চুড়কা মুর্মু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চকরামপ্রসাদ গ্রামের শাখার মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। প্রতি বছর ১৮ আগস্ট তাঁহার বলিদান দিবসটিকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ সম্পূর্ণ সমাজকে সঙ্গে লইয়া যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করিয়া থাকেন। গ্রামবাসী চকরামপ্রসাদ গ্রামে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সমিতি গঠন করিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি স্মারক বেদী নির্মাণ করিয়াছে। বালুরঘাট শহরে যে বিদ্যালয়ে চুড়কা মুর্মু পড়াশোনা করিয়াছেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি তাঁহার নামে নামাঙ্কিত করিয়াছে। জেলা তথ্যদপ্তরে তাঁহার সম্পর্কিত তথ্যও সংগৃহীত রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট জেলার বিদ্বান ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের দাবি যে, বীর চুড়কার গৌরবময় জীবন ও আত্মবলিদানের কথা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে স্থান লাভ করুক। দেশ রক্ষার্থে তাঁহার বলিদানের ঘটনার কথায় আগামী প্রজন্ম প্রেরণা লাভ করুক।

সুভাষিতম্

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নামহং হি চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্ যা জীবিতে স্পৃহা।। (অষ্টাবক্রগীতা)

অর্থ ঃ আমি শরীর নই, এই শরীর আমার নয়, আমি জীবও নই। আমি চৈতন্য। আমার ভেতরের বেঁচে থাকার ইচ্ছাই আমার বন্ধনের কারণ।

দাগি নেতা আর দেশদ্রোহীর বিচার বিলম্বিত হলে তা 'বিচার অস্বীকার' হয়

ন্যায়বিচার ও অস্বীকার

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

'জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনায়েড'। বিলম্বিত বিচার হলো বিচার অস্বীকার। বিচারপতিরা উলটো দাবি করেন 'জাস্টিস হারিড জাস্টিস বারিড'। বিচার তড়িঘড়ি করলে তাকে কবর দেওয়া হয়। কেন পুরনো শাসকের দাগি নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া আশ্বাস নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরকারি তদন্তে বাধা দিয়েছিলেন। বলপূর্বক সরকারি ফাইল ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দিব্য ঘুরে বেরিয়েছেন। তার পরিবারের ঘনিষ্ঠরা দাপটে লুঠতরাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এতদিনে এদের সকলের জেলে থাকা উচিত ছিল।

তেলাপোকারা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করে বলেছেন ওই রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে আটকাতে তিনি পদত্যাগ করছেন। সরকারের শুভানুধ্যায়ীরাও সেই মতো উপদেশ দিয়েছিলেন। সরকার তা শুনেছে। তাদের উপদেশেই ২০২১-এর ১৪ নভেম্বরে কৃষি বিল প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

রাজ্যপাটে লেখা হয়েছিল এই রাজ্যের দেশ বিরোধীরা কীভাবে তেলাপোকাদের লেজুড় হয়ে গণ্ডগোল বাধাতে চাইছে। এরকম ৭০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৬ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে। বলতে ঘৃণা হয় যে দেশ ও সরকার বিরোধিতার নেতৃত্বে এবারও মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু দুষ্কৃতীর নাম রয়েছে। এই সম্প্রদায়কে বারবার সমাজ বিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরনো শাসক দলের পদলেহী হয়ে ২৪ জুলাই তারা কলকাতায় সংবাদমাধ্যম আর পুলিশকে আক্রমণ করে। দেশদ্রোহী বাম জমানা থেকেই এদের মদত দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকার যে 'গুন্ডা দমন' বিল এনেছে তা কতটা কার্যকর এবার তা বোঝা যাবে। তেলাপোকাদের রাজনৈতিক মদত ছিল। উদ্দেশ্য— আসন্ন সংসদ অধিবেশনে বিদেশি আয় বিল (এফসিআরএ) এবং সীমানা নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) বিল বানচাল করা। সংসদের বাইরে সবরকম রাষ্ট্রদ্রোহের কাজে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে পরামর্শ দিচ্ছে এক ভোট বিশ্লেষক। আর এখানে দেশদ্রোহী বাম আর তস্কর দলকে মদত দিচ্ছে বাংলাদেশের মোল্লাবাদীর দল। দু'জনের এক উদ্দেশ্য— রাষ্ট্রবাদী আর জাতীয়তাপ্রেমী বিজেপি সরকারকে সমস্যায় ফেলে বিদেশি গুন্ডাদের (ডিপ স্টেট) থেকে আর্থিক মদত নেওয়া।

রাজ্যের পুরনো শাসক দল ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জাতীয়তা বিরোধী মূলশক্তি বিদেশি বাম। এই শ্রেণী বিদ্বেষীদের ধ্বংস না করলে রাষ্ট্রবোধ আর হিন্দুত্বকে এগোনো যাবে না। ২০২১-র পর থেকে তিনটি ভোট তারা সাফল্যের সঙ্গে হেরেছে।

রাজ্যের পুরনো শাসক দল ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জাতীয়তা বিরোধী মূলশক্তি বিদেশি বাম। এই শ্রেণী বিদ্বেষীদের ধ্বংস না করলে রাষ্ট্রবোধ আর হিন্দুত্বকে এগোনো যাবে না।

৯৫ শতাংশ আসনে জমানত জব্দ হয়েছে। কিন্তু দেশে অন্তর্ঘাত আর দেশ বিরোধী কাজ তারা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮ সালে ত্রিপুরাতে ২৫ বছরের অত্যাচারী বিদেশি বাম শাসনের অবসান হয়। ওই রাজ্য থেকে বিজেপি তাদের নাম আর নিশান মুছে দিয়েছে। এখানেও তাই করতে হবে। আগের তস্কর সরকার বামেদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি। চোরেরা মাসতুতো ভাই। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মিলিজুলিতেই ২০২৬ পর্যন্ত চলেছিল। তস্কর সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৩৪ বছর দেশদ্রোহী বাম কোনোরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়নি। কখনো গ্রেপ্তার বা আটক করেনি। কেবল মুসলমান ভোট ব্যাংকের ভাগাভাগি নিয়েই ছিল মূল লড়াই।

ত্রিপুরার মতো এখানেও বিজেপিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। বিদেশি ধ্যানধারণায় পুষ্ট গণতন্ত্রের সাধারণ নিয়মে যে কোনো ধরনের সরকারি দীর্ঘসূত্রতা মানুষকে অধৈর্য করে তোলে। ২৯৪-এর ভিতর ২০০-র ওপর আসন আর আনুমানিক ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ফলে তাদের কাছ থেকে মানুষের অনেক আশা। সে আস্থা বেড়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। ২০১৬ আর ২০২১-এর ভোটে ২০০-র বেশি আসন পেয়েছিল আগের তস্কর সরকার। পুরো রাজ্যটাই তস্করদের গ্রাসে চলে গিয়েছিল। ২০২৬-এর ভোটে তারা ৮০-তে নেমে যায়। ভোটার হলো নিঃশব্দ স্রোত। কখন দু'কুল ভেঙে বান ডাকবে বোঝা মুশকিল। সরকারকে তার ভাষা বুঝতে হবে। দাগি নেতা বা শাসনকার্যে বাধাদানকারী দেশদ্রোহী দলের মাথা কেটে ফেলাই শাস্ত্রীয় বিধান। বাস্তবায়ন দেরি হলে ডিনায়াল অব জাস্টিস বা ন্যায়বিচারকে অস্বীকার হয়। মানুষের নজর সরে যায়।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মোদী জাদুকরের খেলা দেখলেন দিদি!

বঞ্চিতেষু দিদি,

আপনার কষ্ট বুঝতে পারছি। জাতীয় রাজনীতিতে এত খেলা চলছে কিন্তু আপনি সেসব থেকে বঞ্চিত। কেউ আপনাকে খেলায় নিচ্ছে না। এদিকে আপনার ভাইয়েরা সেমসাইড গোল দিতেই ব্যস্ত। আপনি চেয়েছিলেন দিল্লিতে আরশোলাদের জমায়েতে গিয়ে একটু আলো খাবেন। কিন্তু তার আগেই নরেন্দ্র মোদী এমন ম্যাজিক দেখালেন যে, সব খেলা শেষ। আপনার দিল্লি যাওয়াই হলো না। কালীঘাট টু কালীঘাট কেমন জীবন কাটছে সে আমি অনুভব করতে পারছি। কীভাবে সব রাজনৈতিক আলো থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন সেটাই ভাবছি!

এই রাজ্যে পিসি সরকার মানে সবাই বিশ্বখ্যাত জাদুকর প্রতুল চন্দ্র সরকার (সিনিয়র) বা তাঁর পুত্র জুনিয়রকে চেনে। আপনিও ১৫ বছর পিসি সরকার চালিয়েছেন যেটা আসলে ছিল টু দ্য ভাইপো, বাই দ্য ভাইপো, ফর দ্য ভাইপো। কিন্তু মোদী জানেন আসল ম্যাজিক কাকে বলে। ভেঙেই বলি গোটাটা।

আরশোলারা বড়ো ছক কষেছিল। গোলমাল পাকানোর জন্য আরশোলারা আরও অনেক কিছু পরিকল্পনা করেছিল। সে সবের আগেই এক মধ্যরাতে মোদী এলেন সমাজমাধ্যমে। তাতেও একেবারে অন্য রূপ।

সাজানো স্টুডিয়োর ঝাঁ-চকচকে পরিবেশ নেই। নেই, হাজার হাজার ওয়াটের আলোর দ্যুতি। নিতান্তই সাদামাটা, 'ঘরোয়া' আবহে মধ্যরাতে ভিডিয়োবার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নেটমাধ্যমে রিল্‌সের আদলের সেই ভিডিয়োবার্তায় বদলে গেল তাঁর সম্ভাষণও। পর পর দু'দিন। পরিচিত 'মিত্রোঁ' সম্বোধনের পরিবর্তে শ্রোতাদের উদ্দেশে 'ফ্রেন্ডস' শব্দটি ব্যবহার করলেন প্রধানমন্ত্রী। নিট-এর প্রশ্নফাঁস ঘিরে দেশজোড়া আন্দোলনের আবহে মোদীর এই পরিবর্তন চোখ টেনেছে অনেকেরই। জানুন দিদি, কেন এই কৌশল বদল?

এবার তাঁর ভিডিয়োবার্তা কোনো প্রধানমন্ত্রীর নয়, এক সংবেদনশীল অভিভাবকের। আম নেটাগরিকের 'ফেসবুক লাইভ' বা 'ইনস্টাগ্রাম রিলস্'। মোদীর নিশানায় থাকা শ্রোতাগোষ্ঠীই হয়ে উঠেছে এই পরিবর্তনের অনুঘটক। যে জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে মোদী রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, সেই জেন-জি রাত ৮টার টেলিভিশন সম্প্রচার দেখার জন্য বসে থাকে না। তারা কয়েক সেকেন্ডের ভার্টিকাল ভিডিয়ো ক্লিপ, দ্রুতগতির ভিজুয়াল স্টোরিটেলিং এবং অ্যালগরিদম-নির্বাচিত সমাজমাধ্যমের 'ফিড'-এ তথ্য গ্রহণ করে। আর তাই নিট-কাণ্ড ঘিরে উত্তাল আন্দোলনের আবহে এই বদল।

নিট-এর প্রশ্নফাঁস ঘিরে দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র-যুবাদের ধারাবাহিক বিক্ষোভের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স পোস্টে লিখেছিলেন, 'প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। তাঁদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা 'ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং আধিকারিকদের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।' রাতে কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা সচিব বিনীত জোশীকেও অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় কেন্দ্রের তরফে। এর পরে ভিডিয়োবার্তায় শেষপর্যন্ত মধ্যরাতে 'ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট' এবং প্রশ্নফাঁসে কড়া আইন কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দিয়েই সোনম ওয়াংচুকের 'অনির্দিষ্ট কালের অনশন' প্রত্যাহারে সফল হয় মোদী সরকার।

রাত তখন ১১টা বেজে ৫০ মিনিট। ২ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়োবার্তা প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'প্রশ্নফাঁস কোনো সাধারণ বিষয় নয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের জন্য এটি কষ্টদায়ক।' তিনি জানান, এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আড়াই মাসে সরকারের তরফে অনেক পদক্ষেপ করা হয়েছে। দোষীদের গ্রেপ্তার করে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। এমনকী দাবি করেন, শিক্ষার্থীদের যাতে এক বছর নষ্ট না হয় তাই দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পরের দিন শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ৪০ সেকেন্ডের ভিডিয়ো প্রকাশ করে মোদী বলেন, 'ধন্যবাদ বন্ধুরা। কাল বেশি রাতে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুয়োগ হয়ে গিয়েছিল। যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলাম, তাতে আপনারা যেভাবে সাড়া, পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।' বক্তব্যের শেষে আরও একবার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা--- ভালোবাসা জারি থাকবে। যোগাযোগ বাড়তে থাকবে আরও 'সক্রিয়' ভাবে। ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'গতকাল যাঁরা আমার ভিডিয়ো দেখেছেন ও মূল্যবান পরামর্শ পাঠিয়েছেন, সেই সমস্ত তরুণ-তরুণীকে ধন্যবাদ।

সব কিন্তু নিমেষে শান্ত হয়ে গেল। এবার অনেকেই এটা করবেন। কিন্তু প্রথমটা করে দিলেন মোদী। ভাবুন তো, আরজি করের সময়ে আপনিও তো এটা করতে পারতেন। আসলে দিদি, মাথায় আসেনি। আমারও না। এলে আপনাকে ঠিক অনুরোধ করতাম। আসলে দিদি, এই মুহূর্তে ভারতে তো বটেই শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কের পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ ইনফ্লুয়েনসারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী।

শুনলাম, ওই দুটি ভিডিয়ো নাকি, ভিউজ, শেয়ার ও কমেন্টের নিরিখে ভাইরাল হওয়ার একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছে। □

কী কাণ্ড! সঙ্ঘের বার্থ সার্টিফিকেট নেই!

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা 'সঙ্ঘ' বাস্তবে একটি চেতনা। একটি চিন্তাধারা। একটি পথ দেখানোর আদর্শ। সুসংগঠিত হিন্দুসমাজ গঠনের মাধ্যমে মানব সভ্যতায় চিরন্তন ভারতীয় মূল্যবোধের সঞ্চার করার লক্ষ্যে একটি সংগঠন। নিজ সমাজকে উপলক্ষ্য করে বৃহত্তর মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাষ্ট্রচেতনার এই স্রোতকে আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে কার কী উন্নতি সাধিত হবে?

অভিমন্যু রায়

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বয়স একশো পার বছর হয়ে গেল। কিন্তু তার বার্থ সার্টিফিকেট নেই। গত একশো বছরে তিন-তিনবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা ধোপে টেকেনি। যখন যখন সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়, তখন তখন কিন্তু কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেসের সরকার। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু, দ্বিতীয়বার ইন্দিরা গান্ধী, তৃতীয়বার নরসিমা রাও। তারা কেউই পারেননি সঙ্ঘকে রুখতে। আজকাল ময়দানে নেমেছেন পিতার আলোয় আলোকিত প্রিয়াঙ্ক খাড়গে। তিনি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পুত্র।

প্রিয়াঙ্ক খাড়গে পারবেন না। উনি জানেন যে পারবেন না। খাড়গে সাহেব নেহরু, প্যাটেল, ইন্দিরা বা নরসিমার মতো বিশাল কেউ নন। আর অন্যদিকে সঙ্ঘ আজ একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান। উনি কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সত্যি কথা হলো শুধু উনিই নন, সঙ্ঘকে বেড়ি পড়াতে কেউই পারবেন না। কারণ বেড়ি কাকে পড়ানো যায়? যার অস্তিত্ব আছে, তাকেই তো? সঙ্ঘের তো অস্তিত্বই নেই! ভাবছেন কী প্রলাপ বকছি? তবে শুনুন, কাগজে কলমে 'সঙ্ঘ' বলে বাস্তবেই কিছু নেই।

বলবেন, এই তো মাঠে গৈরিক ধ্বজ উড়িয়ে সাদা শার্ট, খয়েরি প্যান্ট পরে কিছু তরুণ যুবক ব্যায়াম করে, খুব ভোরে কিংবা বিকেলে। ওরাই তো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। হ্যাঁ, আপনি জানেন যে, ওটা সঙ্ঘ শাখা। আপনি জানেন ওরা আরএসএস। ওরাও জানে ওটা সঙ্ঘ শাখা এবং তারা সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। কিন্তু আইনের চোখে চাই লিখিত প্রমাণ। সেটা কোথায়?

শুনে আশ্চর্য হবেন, বিগত ১০০ বছর ধরে সঙ্ঘ চলেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বয়ংসেবকদের কোনো তালিকা নেই। কোনো রেজিস্টার নেই। কোনো মেম্বারশিপ নেই। কোনো রসিদ নেই। কোনো ফর্ম নেই, যা ভরে আপনি স্বয়ংসেবক হবার জন্য আবেদন করবেন।

সম্প্রতি বড়ো উকিল কপিল সিবাল বলেছেন, 'আরএসএস'-এর এতো বড়ো বড়ো বাড়ি, অফিস। এগুলোর কোনো হিসেব হবে না? টাকা কোত্থেকে আসে? কে খরচ করে?

কপিল সিবালও জেনে আশ্চর্য হবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে এক টাকারও স্থাবর সম্পত্তি কোথাও নেই। 'সঙ্ঘ' কিছু মানুষের একটি স্বেচ্ছা একত্রীকরণ মাত্র। ভারতের কোনো আইনে এই একত্রীকরণ বা মিলনের নিবন্ধীকরণ অনিবার্য নয়। এটাই ঘটনা।

তবে কার রেজিস্ট্রেশন করাবেন খাগড়ে? 'আরএসএস'-এর? ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। জনা পনেরো তরুণ যুবক বিজয়া দশমীর দিন স্থির করলেন হিন্দুদের সংগঠিত করবেন। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রতিনিধি হিন্দুরা কালের বিবর্তনে হাজারো অন্তর্নিহিত সমস্যায় জর্জরিত। হিন্দুরা নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্য ভুলে গেছে। জাতপাত, ভাষা আর পন্থ উপপন্থের ঝগড়ায় হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে। এই সব দুর্বলতা দূর করে ভারতবর্ষের মহান সভ্যতার পুনর্জাগরণ এবং হিন্দুদের হিন্দু পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁরা সেদিন একত্রিত হয়েছিলেন। সেই একত্রীকরণের প্রচেষ্টা ১০০ বছর পার হয়ে চলেছে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামে। গত শতাব্দীতে একদিনের জন্যও এই কাজ বন্ধ হয়নি। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণার সময়ও সঙ্ঘের একত্রীকরণ থেমে থাকেনি। তখন স্বয়ংসেবকরা সাদা জামা, খাকি প্যান্ট হয়তো পরেননি। সাধারণ পোশাকে স্বয়ংসেবকরা মাঠে গিয়েছেন। কার্যক্রম করেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হতে গেলে আপনাকে শাখায় যেতে হবে। আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। আপনাকে ভারতমাতার সেবার জন্য কটিবদ্ধ হওয়ার সংকল্প-আধারিত একটি প্রার্থনা করতে হবে। ব্যস্, কোনো ফর্ম ভরতে হবে না, বড়ো কোনো জাবদা খাতায় নাম ওঠাতে হবে না। আপনি স্বেচ্ছায় শাখায় এলেন, সময় দিলেন, কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে পালন করলেন। আপনি 'স্বয়ংসেবক' হয়ে উঠলেন। আর সমাজের চোখে হয়ে উঠলেন— 'আরএসএস'। আবার যেদিন আপনি মনে করলেন যে আপনি আর সময় দিতে পারছেন না বা সঙ্ঘে থাকতে চান না, আপনি বের হয়ে এলেন। মাঠে (সঙ্ঘস্থানে) বা কার্যক্রমে গেলেন না। দায়িত্বমুক্ত

হয়ে গেলেন। কোনো ইস্তফা নেই, কোনো খাতা থেকে নাম কাটার প্রসঙ্গ নেই, কোনো জবাবদিহি নেই। আপনি শাখায় যাচ্ছেন না সেটাই যথেষ্ট ।

এই যেখানে একটি সংগঠনের মূলগত গঠন প্রক্রিয়া, তখন তার কীসের রেজিস্ট্রেশন? ভারতীয় আইনে কিছু মানুষের একত্রীকরণকে নিবন্ধিত হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিশেষ করে যখন সেই মানুষরা সরকারের কাছে কিছু চাইছেন না। সঙ্ঘ তো কেন্দ্র বা কোনো রাজ্য সরকারের কাছে কোনো বিশেষ সুবিধা দাবি করে না। কোনো অনুদান চায় না। তাহলে আপনি একে কোন আইনে তালিকাভুক্ত করার দাবি করবেন?

অনেকেই বলেন, 'আরএসএস'-এর কোটি কোটি টাকা। এই টাকার ওপর কেন ট্যাক্স ধার্য হবে না? আগেই জেনেছেন যে, সঙ্ঘ কোনো চাঁদা তোলে না। সঙ্ঘের কোনো মেম্বারশিপ ফি নেই। তাহলে এই সংগঠনটি চলে কী করে? 'সঙ্ঘ' পরিচালিত হয় স্বয়ংসেবকদের স্বেচ্ছা দানে, স্বয়ংসেবকরা তাকে সমর্পণ বলেন। 'গুরুপূর্ণিমা' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বার্ষিক ছয়টি বিধিবদ্ধ উৎসবের একটি। গুরুপূর্ণিমা হিন্দু ঐতিহ্যের একটি মহত্ত্বপূর্ণ পরম্পরা। যে গুরুর কাছ থেকে আপনি শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করলেন, বিভিন্ন বিদ্যা গ্রহণ করলেন, হাতেকলমে অনেক কিছু শিখলেন, জ্ঞান লাভ করে সমৃদ্ধ হলেন— বছরের একটি নির্দিষ্ট তিথিতে তাঁর শ্রীচরণে পূজা করে আপনার সাধ্যমতো গুরুদক্ষিণা অর্পণ করার মাধ্যমে আপনি তাঁকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করলেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে শান্তি অনুভব করলেন। মনে রাখবেন, হিন্দুধর্মে পারিবারিক কোনো উৎসব আয়োজনে আপনি আপনার চোদ্দ পুরুষকে জলদান করে তবেই শুভকাজ শুরু করেন। এই জলদান সাংকেতিক। আপনি শুভ কাজের শুরুতে আপনার যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের শ্রদ্ধা জানান ও স্মরণ করেন। এটাই কৃতজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরু কে? যিনি ১০০ বছর আগে সঙ্ঘ শুরু করেছিলেন সেই ডাক্তার হেডগেওয়ার? না। সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর, যাকে স্বয়ংসেবকরা 'গুরুজী' নামে অভিহিত করেন? না, তিনিও নন।

সঙ্ঘের গুরু একটি সামান্য বস্ত্রখণ্ড। মাঠে সঙ্ঘের শাখায় যে গৈরিক ধ্বজ উত্তোলিত হয়, সেই গৈরিক ধ্বজই স্বয়ংসেবকদের গুরু। গুরুপূর্ণিমার দিনে সেই ধ্বজের নীচে স্বয়ংসেবকরা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় যে সমর্পণের মাধ্যমে গুরুপূজন করেন, তাই-ই গুরুদক্ষিণা রূপে সংগৃহীত হয়ে সংবৎসর সঙ্ঘের কাজে লাগে।

চেষ্টা একবার হয়েছিল সঙ্ঘের গুরুদক্ষিণাকে আয়করের আওতায় আনার। ইন্দিরা গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৭০ সাল। বোম্বাই ও পাটনার আয়কর আধিকারিকের কাছ থেকে সঙ্ঘের গুরুদক্ষিণার উপর আয়কর চাওয়া হয়। এই নিয়ে মামলা হয়। অবশেষে আয়কর অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল জানায়, গুরুদক্ষিণা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ আয়করের আওতায় আসে না। ১৯৯৪ সালে পাটনা হাইকোর্ট এই আয়কর অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের এই রায়কে সমর্থন করে।

সত্যি ঘটনা হলো, স্বয়ংসেবকদের টাকার প্রয়োজন খুব একটা হয়ও না। সঙ্ঘের শাখায় যে সামান্য খরচ হয় স্বয়ংসেবকরা তা নিজেরাই অল্প অল্প করে বহন করেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে ইউনিফর্ম বা গণবেশ ব্যবহার করেন সেটা তারা নিজেরাই কিনে বা বানিয়ে নেন। কোথাও সঙ্ঘের কাজে যেতে হলে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে যান। সঙ্ঘে কোনো বিল সিস্টেম নেই। বিল পেমেন্টের ব্যবস্থাও নেই। স্বয়ংসেবকরা সব কিছু জেনেই সঙ্ঘে আসেন। দেশের কাজে, দশের কাজে, সমাজ নবনির্মাণের কাজে তন, মন ও ধন বাজি রেখেই একজন স্বয়ংসেবক কাজে নামেন। সঙ্ঘ থেকে কিছু পাওয়ার কোনো আশা কেউ রাখেন না। এখানে সবাই দিতে আসেন।

সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকালে দেশে ছিল ইংরেজ শাসন। তখন বিভিন্ন সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম চালু হয়নি। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেল খেটেছেন তিনি। ভারতবর্ষের মূল যে সমাজ অর্থাৎ হিন্দু সমাজের পুনর্নির্মাণের জন্য ইংরেজের কাছে নিবন্ধনের কথা সঙ্ঘ তখন ভাবতেই পারেনি। এভাবেই চলে এসেছে, দশকের পর দশক।

তবে এটা ঠিক স্বয়ংসেবকদের প্রেরণায় অনেক সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। বিএমএস, বিদ্যা ভারতী, বিদ্যার্থী পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সরস্বতী শিশুমন্দির, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ— এদের সবার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা 'সঙ্ঘ' বাস্তবে একটি চেতনা। একটি চিন্তাধারা। একটি পথ দেখানোর আদর্শ। সুসংগঠিত হিন্দুসমাজ গঠনের মাধ্যমে মানব সভ্যতায় চিরন্তন ভারতীয় মূল্যবোধের সঞ্চার করার লক্ষ্যে একটি সংগঠন। নিজ সমাজকে উপলক্ষ্য করে বৃহত্তর মানবতার সেবায় নিয়োজিত রাষ্ট্রচেতনার এই স্রোতকে আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে কার কী উন্নতি সাধিত হবে?

আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত সুবিধা পেয়েও প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। কিন্তু কোনোদিন গান্ধী পরিবারের সুনজরে পড়ে কর্ণাটক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি হতে পারেন, হয়তো সেই চেষ্টায় আছেন। তাই সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এত মাতামাতি শুরু করেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গত ১০০ বছর যেভাবে চলেছে, নীরবে রাষ্ট্রসেবায় রত থেকে, সেভাবেই চলতে থাকবে। খাড়্গে সাহেবদের কল্যাণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'চার দিন বা দু'চার সপ্তাহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ার শিরোনামে জ্বলজ্বল করবে সঙ্ঘ, এই আর কী! ▫

নিট প্রশ্ন ফাঁস কীভাবে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়?

গত ২৭ জুলাই নিট প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, নিট (ইউজি) পরীক্ষা অনলাইন পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হলে নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন। কম্পিউটার-ভিত্তিক মডেলে পরীক্ষাটি পরিচালনা-সহ কাঠামোগত সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ চেয়ে দায়ের হওয়া আবেদনের শুনানিতে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি পিএস নরসিংহ ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে যে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্র কর্তৃক গঠিত নন্দন নিলেকানির নেতৃত্বাধীন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্সের পরামর্শগুলি তারা খতিয়ে দেখবে। বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে, 'ওএমআর-শিট' ভিত্তিক ফিজিক্যাল মোড থেকে অনলাইন মোডে নিট পরীক্ষা পদ্ধতি স্থানান্তরের জন্য কিছু উদ্ভাবনীমূলক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হবে। আদালত বলেছে যে, নিট-এর প্রেক্ষিতে সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটাবেস সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত সুরক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। আদালত এদিন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি-র কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে বিচারাধীন অন্যান্য আবেদনের সঙ্গে এই আবেদনটিরও শুনানি হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে গত ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট (ইউজি) পরীক্ষা বাতিল এবং পুনঃপরীক্ষা ঘোষণার পর আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিংহের দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানি করছিল আদালত। বেঞ্চ এদিন শুনানি মুলতুবি করে এবং আবেদনটির বিস্তারিত শুনানির উদ্দেশ্যে ৩ আগস্টের জন্য তালিকাভুক্ত করে। কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন— কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং নিট পরীক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠন করেছে। তিনি বলেন— প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই পদক্ষেপের বিষয়ে ঘোষণা করেছেন এবং এই প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নন্দন নিলেকানি। কমিটিতে রয়েছেন— ইসরো-র প্রাক্তন প্রধান এস. সোমনাথ, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো-র প্রাক্তন অধিকর্তা তপন ডেকা, আইআইটি, মাদ্রাজ-এর অধিকর্তা ভি. কামাকোটি, প্রাক্তন শিক্ষাসচিব অনিতা কারওয়াল ও লজিস্টিক্স বিশেষজ্ঞ অমৃতলাল মীনা। নিট প্রক্রিয়ায় সংস্কারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুষার মেহতা এদিন তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১ জুন সুপ্রিম কোর্ট সুধাকর সিংহের দায়ের করা আবেদনটি জরুরি ভিত্তিতে শুনতে অস্বীকার করে, যেখানে তিনি ২১ জুন কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে 'নিট (ইউজি), ২০২৬'-এর পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছিলেন। এর আগে, গত ১২ মে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার কারণে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) গত ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট (ইউজি) পরীক্ষাটি বাতিল করে দেয়। গত ২১ জুন পুনঃপরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং সিবিআই এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টির তদন্ত করছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর— ২০২৭ থেকে প্রচলিত কাগজ-কলমের 'ওএমআর' পদ্ধতি থেকে পুরোপুরি কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা (কম্পিউটার-বেস্‌ড্ টেস্ট বা সিবিটি) পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হতে চলেছে নিট (ইউজি)। এই ডিজিটাল পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো কাগজের ব্যবহার বন্ধ করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করা এবং পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

শিক্ষাবিদ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মত হলো মেডিক্যাল এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিট-এর সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অ্যাডপশন পদ্ধতি হলো একমাত্র রাস্তা। আজকের JEE Main বা JEE Advanced-এর মতো ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষাও কিন্তু প্রশ্নফাঁসের সম্ভাবনা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। যদিও দু'টি পরীক্ষা-পদ্ধতিই কম্পিউটার-ভিত্তিক। JEE-তে প্রতিদিন আলাদা প্রশ্ন হয়। প্রতিদিন আলাদা র‍্যাঙ্কিং। তারপর এগুলো মিশিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটা সেটের প্রশ্ন যদি ফাঁস হয়, সেটা কিনে লাভ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে সেটা কেউ কিনবে না। কিন্তু এখানে একটা ঝুঁকি রয়েছে। ধরা যাক, কেউ কেমিস্ট্রিতে খারাপ। সে যেদিন পরীক্ষা দিতে বসলো, সেদিন কেমিস্ট্রি প্রশ্ন খুব কঠিন এলে তার লাভ। তেমনই অঙ্ক বা ফিজিক্সের প্রশ্ন কঠিন এলে যারা এই বিষয়গুলিতে ততটা দক্ষ নয়— প্রশ্ন জানতে না পারলে তারা প্রতিযোগিতা থেকে আউট। এখানে কে কোন দিন পরীক্ষা দিতে বসছে, তার ওপরে তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করছে। ইউপিএসসি-র ব্যবস্থা তো আরও খারাপ আমাদের দেশে। বামপন্থীদের সুবিধার জন্য সোশিওলজি-তে সহজ প্রশ্ন করা হয় গত ৬০ বছর ধরে। অথচ ইউপিএসসি-তে একই পরীক্ষা পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমে নেতিবাচক লোকজন ঢোকানোর জন্য। বর্তমানে কম্পিউটার অ্যাডপশন এমন পদ্ধতি যা GRE, GMAT ইত্যাদি পরীক্ষায় বহুদিন আগে থেকেই প্রয়োগ হচ্ছে। এখানে পদ্ধতিটা হলো— ০ থেকে ৫০-এর লেভেল হলো সহজ প্রশ্ন। এই লেভেলটি উত্তীর্ণ হলে একটু কঠিন প্রশ্ন আসবে ৫০ থেকে ৬০ লেভেলের জন্য। ৫০ থেকে ৬০ লেভেলের দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে ৬০ থেকে ৭০ লেভেলে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, না পারলে আবার ০ থেকে ৫০-এর লেভেলে ফিরে আসতে হবে। এই ধরনের পরীক্ষায় পরপর কয়েক হাজার প্রশ্ন থাকে। যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে ওই লেভেলের। JEE Advanced-এ হয়তো ২০২৮-এ প্রথমবার এই পদ্ধতি শুরু হবে।

আজ আরশোলারা যখন আন্দোলন করছে, তখন ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত দেশজুড়ে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তালিকাও প্রকাশ্যে আসছে। এবার বিরোধী দল আপ ও কংগ্রেস-শাসিত পঞ্জাব ও কর্ণাটকে নিট (ইউজি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। ককরোচ জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেও পঞ্জাব ও কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রীদের পদত্যাগ কিন্তু দাবি করেনি। যতদিন নিট (ইউজি) পরীক্ষা পুরোপুরি কম্পিউটার-বেস্‌ড্ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু প্রশ্নফাঁসের সম্ভাবনা থেকেই যায়। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, প্রশ্নকর্তা, প্রশ্নপত্র ছাপানোর প্রেস এবং যারা সেই প্রশ্নপত্র বিভিন্ন টেস্ট-সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছে— তারা সবাই ১০০ শতাংশ সৎ হবে, তবে তা মস্ত বড়ো ভুল হচ্ছে। আজ থেকে ২৫ বছর আগে GRE পরীক্ষার ক্ষেত্রে কম্পিউটার অ্যাডপশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। অথচ নিট (ইউজি) মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এনটিএ আজও তা প্রয়োগ করতে পারল না। বাধা কোথায়? অবশ্যই ভারতীয় 'আমলাতন্ত্র'। যে কোনো বিষয়ে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আমলা-নির্ভরতা কমিয়ে স্বাধীনভাবে সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করতে হবে। □

বাংলাদেশে সরকারের পরিবর্তন হয় ঠিকই, কিন্তু সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না

রঞ্জন কুমার দে

অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে হিন্দুশূন্য হতে চলেছে বাংলাদেশ। হিন্দুবহুল আফগানিস্তান, পাকিস্তানের পর বাংলাদেশও একই পথে। ১৯০১ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল ৩৩ শতাংশ, দেশ ভাগাভাগিতে ১৯৫১ সালে ২২ শতাংশ, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে ১৩ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ১০ শতাংশ, শেষ গণনায় ২০২১ সালে ৭.৯ শতাংশে। ২০২৬ সালে অনুমান করা হচ্ছে সেই সংখ্যা ৫ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। দেশটিতে ধারাবাহিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনবিন্যাসের অধঃক্রম নির্দিষ্ট কোনো একটি কারণ নয়, তবে কেন্দ্রবিন্দু এক, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর তাঁদের আক্রমণের ধারা অব্যাহত থাকে। টানা ১৭ বছর শেখ হাসিনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, হিন্দুরা ছিল তাঁর পকেট ভোট। প্রত্যেক জেলায় জেলায় করেছেন মডেল মসজিদ, মাদ্রাসা। কৌমি শিক্ষাকে মাস্টার্সের মর্যাদা দিয়ে হয়েছেন কৌমি মাতা, ইসলাম অবমাননার অভিযোগে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সহজে হয়রানি করতে লাগু করে গেছেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। বর্তমান সরকার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে একটি সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল স্তম্ভ থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাতিল করেন এবং তার জায়গায় 'সর্বশক্তিমান আল্লার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সরকারিভাবে কোণঠাসা হতে শুরু করে। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসক এরশাদ ইসলামকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে ঘোষণা করেন। এবারের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও বাংলাদেশে পদার্পণ করে আগেই ঘোষণা দিয়েছেন— 'দেশ মদিনা সদনে চলবে।' হচ্ছেটাও তাই। তালিবানি দেশ আফগানিস্তানের সমান্তরালে বাংলাদেশেও মহিলাদের পোশাকআশাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ড্রেসকোড। বাংলাদেশ বেতারের এক নির্দেশনামায় জারি করা হয়েছে যে, নারী সংবাদ উপস্থাপিকাদের ওড়না-সহ ফুলহাতা সাদামাটা সালোয়ার-কামিজ অথবা শাড়ি পরতে হবে আর পুরুষদের ফুলহাতা শার্ট ও টাই পরতে হবে।

আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে

প্রত্যেকবার তদন্তে উঠে এসেছে সমস্ত ইসলাম অবমাননার ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ও সাজানো। অসহায় হিন্দু পরিবারগুলিকে সহজে ইসলাম অবমাননার মামলায় ফাঁসিয়ে তাদের সহায় সম্পত্তি, মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করাই ইসলাম অবমাননার মূল চিত্রনাট্য।

সংবিধান এবং ধর্মীয় সুরক্ষার স্বার্থে সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছে বিগত জাতীয় নির্বাচনে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প খোলা ছিল না। তাই তারা মোল্লাবাদী জামাত গোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে দুই হাত উজাড় করে বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। বিএনপি প্রকাশ্যে তার জন্য কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে চালিকাশক্তি জামাতের মোল্লাবাদী কালোছায়া। শত শত জেলবন্দি, জঙ্গি এমনকী দণ্ডপ্রাপ্ত ফাঁসির আসামিও জেল থেকে মুক্তি পেয়ে খোলা আকাশের নীচে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ কেউ আবার সাংসদও হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের অপরাধে ইউনুস সরকারের দুঃশাসনে সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাশ আজও বন্দিদশা ভোগ করছেন। একসময় শেখ হাসিনা জামাতের সমান্তরাল ওলামা লিগ খাড়া করে দেশের মোল্লাবাদীদের স্নেহধন্য হতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এড়াতে পারেননি। একইভাবে তারেক সরকারও একের পর এক ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিপরীত স্বার্থে অবস্থান করেছে, কিন্তু তারেক সাহেব ভুলে গেছেন দেশে ধর্মীয় সদ্ভাব তথা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি লুপ্ত হয়ে গেলে মোল্লাবাদীরা আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। কারণ এরা সংবিধান, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

সম্প্রতি গাইবান্ধা পলাশবাড়িতে স্থানীয় হিন্দুরা নিজেদের জমিতে তাঁদের উপাস্য শ্রীরামমূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে দেশজুড়ে মোল্লাবাদী শক্তির অপপ্রচার, গুজব এবং প্রতিবাদে সরকার তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। দেশজুড়ে এখন আইএসআইয়ের ধাঁচে কালেমার পতাকা মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এরকম একটা

ফঃ ২

বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে যে দেশটা একটা ইসলামিক দেশ, যেখানে কট্টর ইসলাম ব্যতীত ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং সেকুলারদের কোনো ঠাঁই নেই। বাংলাদেশ সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান সম্প্রতি সৌদি আরবে গিয়ে হজ করে এসেছেন এবং হজ পালনের পর থেকে তিনি দাড়ি রাখতে শুরু করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে নবগঠিত একটি ব্যাটেলিয়ানের চারটি কোম্পানির নাম খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবিদের (হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি) নামে রাখা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে দেশের তৌহিদী জনতা তথা মোল্লাবাদীরা সেনাপ্রধানের এইরূপ মজহবি রূপকে খুব বাহবা দিচ্ছে, সঙ্গে তারেক সরকারেও তারা খুশি। তবে এরকম শেখ হাসিনাও বেশ কয়েকবার হজ পালন করেছিলেন এবং পরে মজহবি বেশভূষারও পরিবর্তন এনেছিলেন মোল্লাবাদী শক্তিকে খুশি করার জন্য। তবে এরা জামাত থেকে কখনো ফিরে আসেনি।

দেশটির এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মাদ্রাসামুখি এবং এরকম প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জামাত সমভাবাপন্ন রাজনীতির রবরবা। ক্রমশ মজহবি উগ্রতায় মাদ্রাসাগুলো ফেঁপেফুলে উঠছে, সরকার সেটাতে ইচ্ছা করলেও লাগাম টানতে পারবে না। কিন্তু এইরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেহেতু বিএনপি, আওয়ামি লিগের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, তাই এরা যত শক্তিশালী হবে দেশের গণতন্ত্র তত কমজোর হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে শেখ হাসিনা সুযোগসুবিধা দিয়েছিলেন দুই হাতে, সমান্তরালভাবে এখন তারেক রহমানও দিচ্ছেন। সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত মোল্লাবাদীদের বিরুদ্ধে গেলে এরাই পরদিন রাজপথে সরকারকে ভারতের দালাল আখ্যা দিয়ে জামাতের স্বার্থকে সিদ্ধি করবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার তাদের শাসনকালে মোল্লাবাদী তোষণে মেতে ওঠে, ঠিক উলটো ঘটনা ঘটে যখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ থাকে, তখন এরা ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র ভূমিকায়। কয়েকমাস অন্তর প্রকাশিত হয় নিত্যনতুন সংখ্যালঘু দমনের পদ্ধতি। তবে প্রত্যেকবার সেটা পেছনের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়। সম্প্রতি Human Rights Congress For Bangladesh Minorities (HRCBM) নামক সরকারি এক সংস্থা শুধু ২০২৬ সালের হিন্দুদের উপর নিপীড়নের এক তথ্য প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বছরটিতে শুধু জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কম করেও ৫০৫টির মতো সংখ্যালঘু নিপীড়নের ঘটনা উঠে এসেছে, যেটা আসল সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। কারণ ভুক্তভোগীদের ভয়, রাজনৈতিক চাপ, ব্লাকমেলিং, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, অসহযোগিতা, সজাগতার অভাবে বেশিরভাগ ঘটনা ধাপাচাপা পড়ে যায়। HRCBM-এর মতে নতুন সরকার আসার পরেও হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরও বেশি নেমে এসেছে। ভুয়ো মামলা, ইসলাম অবমাননার ভয় দেখিয়ে হিন্দুদের স্থাবর সম্পত্তি, চাকরি এমনকী ঘরের মেয়েদেরও ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাত্র চার মাসে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ১০০ জন হত্যা, ১৪৪ জন অপহরণ, ধর্ষণ ও যৌন হিংসা ২৮টি, সম্পত্তি ধ্বংস, জবরদখল, লুটপাটের ১৩২টি এবং ধর্মীয় উপাসনাস্থল ভাঙচুরের ৯৫টি ঘটনা সামনে উঠে এসেছে।

এইরকম অনেক রিপোর্ট আগেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেকবার উঠে এসেছে কিন্তু সরকারকে কখনোই শক্ত হাতে রাজধর্ম পালনে দেখা যায়নি। যার দরুন অপরাধীরা এইসব সাম্প্রদায়িক ও অসামাজিক কার্যকলাপে আরও অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। ইসলাম অবমাননার ছুতায় খুব সহজেই হিন্দুদের গোটা একটা গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যায় এবং অভিযুক্তকে বিনা বিচার প্রমাণে জেলে ঢোকানো যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার তদন্তে উঠে আসে এইসব ইসলাম অবমাননার ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ও সাজানো। অসহায় হিন্দু পরিবারগুলিকে সহজে ইসলাম অবমাননার মামলায় ফাঁসিয়ে তাদের সহায় সম্পত্তি, মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করাই ইসলাম অবমাননার মূল চিত্রনাট্য। মোল্লাবাদীদের খুশি রাখতে শেখ হাসিনা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই অভিশপ্ত ইসলাম অবমাননা আইন পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়েছিলেন সংখ্যালঘু হিন্দুদের হেনস্তা ও নিপীড়নের জন্য। সম্প্রতি পিঞ্জুরী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর মিঠু মণ্ডলকে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে আটক ও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শিক্ষক মিঠু মণ্ডল বলেছিলেন, পরীক্ষায় সিলেবাস থেকে কী আসতে পারে ছাত্ররা জানতে চাওয়ায় উত্তর দেন শিক্ষক মিঠু মণ্ডল 'স্বয়ং সৃষ্টি কর্তাও জানে না আর আমি বলবো কীভাবে কী আসবে পরীক্ষায়'। তাতেই তাঁর ওপর ইসলাম অবমাননার অভিযোগ!

আরেক শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরকারকে ইসলাম অবমাননার অভিযোগে চাকরিচ্যুত ও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তিনি ক্লাসে পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'উচ্চ শব্দে মাইকে আজান দেওয়ার অনেকের অসুবিধা হয়, মন্দিরের মাইকে উচ্চ শব্দে বাজনা বাজালেও অসুবিধা হয়।' একজন শিক্ষক ছাত্রদের সঠিক শিক্ষাই দেবে! এগুলো শুধু উদাহরণ। এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত বাংলাদেশে ঘটে চলছে। আগে শুধু মজহবি ওয়াজ মহাফিল, মসজিদের খুতবা, মাদ্রাসায় হিন্দু বিদ্বেষ চলতো, এখন ডিজিটাল যুগে মোল্লাবাদীরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের চ্যানেল খুলে ইচ্ছামতো হিন্দুফোবিয়া নিজেদের মতো প্রচার করছে, যার ফলস্বরূপ সমাজের এই হিন্দু বিদ্বেষের বাড়বাড়ন্ত। নতুন করে বিভিন্ন টেলিভিশনের টক শো অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার ফুয়াদ, শাহরিয়ার কবিরের মতো পাকিস্তানপ্রেমীরা হিন্দু বিদ্বেষের নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। মোল্লাবাদীদের দাবি মেনে দুর্গাপূজায় নামাজের পাঁচ ওয়াক্তে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক বাজানো বন্ধ হয়েছে। অসুরের দাড়িতেও মোল্লাদের সমস্যা, এখন নতুন দাবি রথযাত্রা রাজপথে করা যাবে না। এরা গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে ৮১ ফুট উচ্চতার শ্রীরামমূর্তি নির্মাণে বাধা দিয়ে শুধু ক্লান্ত হয়নি, মূল উদ্যোক্তা হরিদাস চন্দ্র দাসকেও এরা ভুয়ো মামলায় গ্রেপ্তার করিয়েছে। মোল্লাবাদী শক্তি চায় না হিন্দু সমাজে কোনো নেতৃত্ব থাকুক এবং তাদের একের পর এক ফতোয়া ক্রমশ এভাবেই চলমান এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রশ্ন, বাংলাদেশে কি মধ্যযুগীয় শাসন চলছে? ▫

বীর বনবাসী চুড়কা মুর্মুর মাতৃভূমি বন্দনায় জীবন বলিদান

শক্তিপদ ঠাকুর

১৯৫১ সালের ২ জুলাই বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকরামপ্রসাদ গ্রামে চুড়কা মুর্মু জন্মগ্রহণ করে। পিতা খেলারাম মুর্মু, মাতা সুমি হাঁসদা। ছাত্রাবস্থায় সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় যোগদান করে। ১৯৬৯ সালে প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন করে সে নিজের গ্রামে শাখা শুরু করে। সে চকরাম শাখার মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে থাকে। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তার অগ্রণী ভূমিকা থাকত। গ্রামবাসীদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় সে গ্রামে একটি কুয়ো তৈরি করে। গ্রামের সবাই চুড়কার ব্যবহারে মুগ্ধ। পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল ভারত। তাই সেই সময়ে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তি ফৌজের ছদ্মবেশে ভারতের এক মাইল অভ্যন্তরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চককালু গ্রামে পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য সেখান থেকে চকরাম গ্রামের বিএসএফ ক্যাম্পের দখল নেওয়া। এই গ্রামটিকে দখল করতে পারলে তারা অত্যন্ত সহজে তৎকালীন পশ্চিমদিনাজপুর জেলার জেলা সদর বালুরঘাট শহরে আঘাত হানতে পারবে। চককালু থেকে তারা চকরাম গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকে ফলে গ্রামবাসীরা ভীত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

ওই গ্রামে বাস করত চুড়কা। সে বুঝতে পারল যে গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাচ্ছে। তখন চুড়কা সবে জেএলপি বিদ্যাচক্র স্কুল থেকে

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। চুড়কা মুর্মু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চকরাম শাখার মুখ্যশিক্ষক। গ্রামবাসীদের বলল— 'দেশের এই বিপদে আমরা পালাব কেন? চল আমরা বিএসএফ ক্যাম্পে খবর দিই।' কয়েকজনকে নিয়ে চুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পে যায়। ক্যাম্পে তখন মাত্র ৩ জন জওয়ান আছে। তারাও প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জওয়ানরা বলল— তাদের গুলির বাক্স বহন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জওয়ানরা বলল— তাদের গুলির বাক্স বহন করার জন্য কয়েকজনকে চাই। কিন্তু কেউই মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সাহস করে এগিয়ে আসছে না। এই কথা শোনামাত্র চুড়কা এবং তার দুই বন্ধু গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়। চুড়কার বন্ধুরা গুলির বাক্স মাথায় করে একজন জওয়ানের সঙ্গে চকরাম গ্রামের উত্তরদিকে যাত্রা করে। আর চুড়কা গুলির বাক্স মাথায় করে আর একজন জওয়ানের সঙ্গে গ্রামের দক্ষিণদিকে যাত্রা করে। খুব শীঘ্র তারা একটা পুকুরের পাশে পাটখেতের মধ্যে উপস্থিত হয়। বিএসএফ জওয়ানটি একটি বড়ো গাছের পিছনে পজিশন নেয়। জওয়ানটিকে গুলি সরবরাহ করার জন্য চুড়কা পাশের পাটখেতে গুলির বাক্স-সহ লুকিয়ে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। অর্থাৎ ভারতীয় জওয়ানটি পাক সৈন্যদের দ্বারা বন্দি হয়। পাটখেতের মধ্য থেকে চুড়কা সব লক্ষ্য করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতীয় জওয়ানকে নিয়ে চলে যায়।

এমতাবস্থায় চুড়কা ভাবছে, 'আমিও তাদের হাতে ধরা পড়তে পারি। কিন্তু আমাদের গোলাবারুদ পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে কিছুতেই তুলে দেব না।' তাই গুলির বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পাটখেতের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুলির বাক্স-সহ পুকুরের ধারে পৌঁছায়। আগের রাত্রে প্রবল বৃষ্টির জন্য পুকুরের ধার পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য গুলির বাক্স পুকুরে ফেলতে গিয়ে তার পা পিছলে যায়। পরিণামে বাক্স-সহ সেও পুকুরে পড়ে যায়। পুকুরের অন্য পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আর একদল পাকিস্তানি সৈন্য চুড়কাকে দেখে ফেলে। তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে চুড়কার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। চুড়কা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এমনিভাবে চুড়কা আরও অনেকের মতো বীরগতি প্রাপ্ত হয়।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাপতির আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। অনেক হুতাত্মার প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়। সঙ্ঘের শাখা থেকে চুড়কা শিক্ষা নেয় ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে দেশ। এই দেশপ্রেমের সংস্কার তাকে দেশের সৈনিকে পরিণত করল। দেশের বিপদে দেশবাসীর কর্তব্য কী তা চুড়কা তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিদর্শন রেখে গেল।

(বীর বনবাসী : সঙ্কলন শক্তিপদ ঠাকুর। প্রকাশক : পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, ১৯৯৯ থেকে সংগৃহীত)

জনজাতি সমাজ ভারতীয় সমাজজীবনের অভিন্ন অঙ্গ

উত্তম মাহাতো

১৩০ কোটির দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। এর মধ্যে ১১ কোটির বেশি জনজাতি সমাজের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গে ৫.৫ শতাংশ জনজাতির বসবাস (২০০১ জনগণনা অনুযায়ী) আমাদের দেশের গঠন— কোথায় পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল, নদী নালা, মরুভূমি ও গ্রাম শহর দিয়ে। জনজাতি সমাজের বন্ধুরা প্রকৃতি পূজারি হওয়ার কারণে বনজঙ্গলেই বসবাস তাদের। পাহাড়, পর্বত, গাছ, পাথর তাদের পূজাস্থান। জনজাতি সমাজের মধ্যে মারাং বুরুর যে পূজা হয়ে থাকে আসলে তা হলো শিব ঠাকুর। দুর্গাপূজার সময় তাদের আগমনী নাচগান এখনো বহুল প্রচলিত দাশাই। আর কালীপূজাতে সহরাই নাচগান এখনো হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোক মনে করেন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে কন্দরে যে সব জনজাতি বন্ধুরা বসবাস করেন তারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজ। হ্যাঁ, অবশ্যই সেদিকে তারা পিছিয়ে কিন্তু হিন্দু সমাজের রীতিনীতি আচার আচরণে কোনো খামতি নেই। ভারতবর্ষের পরিচয় হলো— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। আজও সাঁওতাল বাড়িতে গেলে প্রথমে পিতলের ঘটিতে ও থালাতে পা ধোয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রতিদিন গোবর দিয়ে ঘর নিকানো, এখনো একসঙ্গে বসবাস করা, জল জঙ্গল সুরক্ষার শপথ তাদের আচার আচরণে। পরিবেশ রক্ষা রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

এছাড়াও ভারতবর্ষের সুরক্ষাতে দেশভক্তির পরীক্ষায় আজও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তাঁরা বিদেশি শত্রুদের চিহ্নিত করার কাজ করে যাচ্ছেন। মহাভারতের ঘটোৎকচ ধর্মের পক্ষ নিয়ে অধর্মের বিনাশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। রামায়ণেও শবরীমাতা ও শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতের কথা আমরা জানি। হনুমান-জাম্বুবানদের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্ক, ধর্ম সমাজ নারীজাতির সুরক্ষা ও মান সম্মান রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশ হাজার বছর পরাধীন থাকার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেওয়া জনজাতি সমাজের গৌরবময় ইতিহাসকে বাদ হয়েছে। বলেছে তাদের কোনো ইতিহাস নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জনজাতি সমাজ বহুকাল ধরে নীরবে সমাজের সেবা কাজ করে চলেছে। ভারতমাতার স্বাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করার জন্য ১৮৫৮ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। জমি ও নিজেদের রক্ষার ইতিহাস 'সরদারি লড়াই' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরদারি লড়াই আন্দোলনের প্রভাবে কোম্পানি সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। গণসংগঠন তৈরির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদ, পুরাণ চর্চা শুরু করে। এখানেই বীরসা মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে সংগঠন তৈরির কাজ হাতে নেন গুরুদেবের নির্দেশে। বিরসা মুণ্ডার আন্দোলনে বঙ্গের জনজাতি সমাজে ও ছোটোনাগপুরের এলাকাতে বিশেষ করে বীরভূমে প্রভাব অবিসংবাদিত।

১৮৫৫ সালে শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ জুন ৩০ হাজারেরও বেশি সাঁওতালকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে প্রথম জনযাত্রা করেন বীর সিধু কানুরা। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য মিছিলের সূচনা, ইংরেজ রাজশক্তিকে দেশ থেকে তাড়ানোর অঙ্গীকার— যেটা হুল দিবস নামে উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু, কানু, চাঁদ ভাইরৌ নেতৃত্ব দিয়েছেন। নারীদেরও ভূমিকা কম ছিল না। ফুলো মুর্মু, ঝানো মুর্মু মহিলাদের 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ফলে ব্রিটিশ সিপাহিরা ঝানো মুর্মুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যা করে তাঁদের দেহকে রেল লাইনে ফেলে যায়। ইতিহাসে প্রথম বীরঙ্গনা হিসেবে সাঁওতাল জাতি তাঁকে আজও শ্রদ্ধা করে। জনজাতি সমাজের দেশের জন্য বলিদান পরম্পরা ১৯৭১ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরের চকরাম প্রসাদ গ্রামের ১ম বর্ষ শিক্ষিত সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক চুড়কা মুর্মু পাকিস্তানি সেনার হাতে আত্মবলিদান ইদানীংকালের বলিদান পরম্পরার উদাহরণ— নিজের গ্রাম, সমাজ ও জাতির দেশরক্ষায়।

১৭৮১ সালে বিহারের জনজাতির ছেলে তিলকা মাঝি সাঁওতাল পরগনা বা ভাগলপুর পর্যন্ত নয়, সম্পূর্ণ দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নেন মাত্র ৩১ বছর বয়সে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর-পূর্ব ভারতে ও মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক সময় কারাবাস করেছিলেন ১৭ বছরের নাগাল্যান্ডের লক্ষ্মীবাই রানিমা গাইদিনল্যু। এই ছোটো সাহসী বালিকা নিজের দেশভক্তির আবেগে ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন।

১৮৩২ সালে ১ মে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মানভূম ও বরাভূমের ভূমিজদের নিয়ে গঙ্গানারায়ণ সিংহ বরাবাজার কাছারি আক্রমণ করেন। ১৪ মে তিন হাজার ভূমিজকে নিয়ে রাসেল সাহেবকে ঘিরে ফেলে। রাসেল সাহেব প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় বরাভূমের পূর্বদিকে আকরো, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর ফুলকুসমা ইত্যাদি স্থানে হামলা চালানোর ফলে সমস্ত এলাকা ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

যে সময় সাঁওতাল সমাজ নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। সেই সময় মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার অন্তর্গত কামারবন্দি গ্রামে জন্ম নেন সাধু রামচাঁদ মুর্মু। এবং তিনি সাঁওতালি সাহিত্য বিকাশে গান রচনা করেন। শাশ্বত ধর্ম গ্রন্থখানি রচনা করেন। তার বহু লেখা অপ্রকাশিত হয়ে পড়ে আছে। বাংলা ১৩৬৯ সালে ২৯ অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করেন। কল্যাণ আশ্রমের দ্বিতীয় সভাপতি জগদেবরাম ওরাং সারা জীবন অকৃতদার থেকে জনজাতি সমাজের জন্য দীর্ঘকাল ধরে স্বাবলম্বন, স্বাধিকার, জল-জঙ্গলের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছেন। দুঃখের বিষয় হলো, যে জনজাতি সমাজ দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় জীবন দিয়েছে, যাঁরা ভারতীয় সমাজের অভিন্ন অঙ্গ, দেশবিরোধী কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাঁদের মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

(পুনঃপ্রকাশিত)

চুড়কা মুর্মু ‘আত্মনির্ভর’ ভারতের প্রতিনিধি
দেশ তাঁর জন্য গর্বিত

অদ্বৈতচরণ দত্ত

দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে বালুরঘাটের চকরামপ্রসাদ গ্রামের চুড়কা মুর্মু আজ আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। আজ যখন আমরা আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সচেষ্ট হয়েছি অর্থাৎ দেশকে স্বাবলম্বী, স্বাভিমানী করে গড়ে তুলতে চাইছি, তখন চুড়কা মুর্মুকে আমাদের সামনে এক অনন্য নজির হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে। দিনটা ছিল ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট, পাকিস্তানি খানসেনার গুলিতে চুড়কা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে বনবাসী সমাজের ইতিহাসে সিধু-কানহুর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। একইসঙ্গে লেখা উচিত, দক্ষিণ দিনাজপুরের চকরামপ্রসাদ গ্রামের বনবাসী সমাজের চুড়কা মুর্মুর নামও। তিনি আমাদের কাছে বিশেষ গর্বের, তাঁর বলিদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের অনেকেরই মনে থাকতে পারে, ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়েছিল। সেই উত্তাল সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি খানসেনারা বর্তমান বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, চকরামপ্রসাদ আচমকাই আক্রমণ করে বসে। চুড়কা বুঝতে পারে যে পাকিস্তানি খানসেনারা তাদের গ্রামে আক্রমণ শানিয়েছে। সুতরাং তাদের গ্রামবাসীদের সজাগ করতে হবে। বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে গোলার বাক্স নিয়ে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিল। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর গ্রামের মাস্টারমশাই হরেন চাকলাদার বলেছেন, ‘‘খান সেনাদের আক্রমণে সব গ্রামবাসী যখন ভয়ে পালাচ্ছে..., সেই দেখে আমিও পালাচ্ছিলাম। তখন চুড়কা আমায় ডেকে বলল, মাস্টারমশাই আপনিও পালাবেন? তার কথায় আমার সংবিৎ ফিরল, আমার ছাত্রের সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, তার জন্য গর্ব অনুভব করলাম। গ্রামবাসীদের সজাগ করলাম, তারা যাতে না পালিয়ে রুখে দাঁড়ায়।’’

এই শিক্ষকের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, কী অসমসাহসী বীরত্ব সেদিন প্রদর্শন করেছিলেন চুড়কা। মাতৃভূমি রক্ষায় তাঁর ভূমিকাও নিঃসন্দেহে চিরকাল উদাহরণ স্বরূপ হয়ে থাকবে। সেভাবে গ্রামবাসীদের সদর্থক সাড়া না পেয়ে চুড়কা মুর্ম একাই বিএসএফের সঙ্গী হয়ে এগিয়ে চললেন পাকিস্তানি খানসেনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। একদিকে খান সেনা, অন্যদিকে বিএসএফ ৩ জন জওয়ান ও চুড়কা। পাটখেত, ধানখেতের মধ্যে লড়াই চলছে। চুড়কা দেখল, তার জীবন বিপন্ন। কিন্তু গ্রামের মানুষের জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, শত্রুপক্ষ যাতে তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, সেইজন্য সে তার কাছে থাকা বন্দুক ও গুলি-ভর্তি বাক্স ও অস্ত্র-সরঞ্জাম পুকুরে ফেলতে আরম্ভ করল, যাতে তা কোনোভাবেই শত্রুসেনার হাত না পড়ে। এই পুকুরে ফেলার শব্দ খান সেনাদের কানে যেতেই মুহুর্মুহু চুড়কার ওপর তারা গুলিবর্ষণ করলো। সে লুটিয়ে পড়ল জলে। তাঁর কণ্ঠ থেকে ‘বন্দেমাতরম্’, ‘ভারতমাতা কী জয়’ ধ্বনি নির্গত হলো। সে বীরগতি প্রাপ্ত হলো।

আজ স্বীকার করতেই হবে যে, চুড়কা মুর্মু আমাদের গর্ব। তাঁর জন্ম ১৮৫১ সালের ২ জুলাই গ্রামের এক দরিদ্র সাঁওতাল পরিবারে। পারিবারিক দারিদ্রের মধ্যেও তিনি দেশের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। ‘জন্ম হোক যথা-তথা, কর্ম হোক ভালো’— এই প্রবাদবাক্যের সার্থক প্রয়োগ দেখলাম আমরা। তিনি আবাল্য স্বয়ংসেবক। প্রয়াণ-সময়ে তিনি একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ প্রথম বর্ষ শিক্ষিত।

আজ আত্মনির্ভর ভারতের সরকারি প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেই চুড়কা নিজের গ্রামকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য গ্রামবাসীদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। গ্রামের উন্নতি কীভাবে করা যায়, এই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। কৃষিকাজ, গোপালন ছাড়াও গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা চুড়কা স্বহস্তে করেছিল। তার গ্রামে যুবক-কিশোরদের জন্য শরীরচর্চা ও পাঠদানের ব্যবস্থাতেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

তাঁর বলিদান দিবস ১৮ আগস্টকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর স্বয়ংসেবকরা তার গ্রামে পৌঁছান। তাঁরা তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, কাবাডি খেলা আয়োজন করা ছাড়াও তাঁর স্মরণে নির্মিত বেদীতে মাল্যদান করে। অংশ নেন স্থানীয় মানুষজন, ছাত্র-যুবরা। এই কার্যক্রম আমাদের পরম্পরা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিগত বহু বছর ধরে। যে স্কুলে তিনি পড়তেন, সেখানে তাঁর নামে ছাত্র-বৃত্তি চালু হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের বই-খাতা-কলম দেওয়া হয় চুড়কা মুর্মুর বলিদান দিবসে। সেখানকার ছাত্রাবাসও তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। তবে একথা সত্যি, এই ধরনের বলিদানের পরম্পরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে বহু আগে থেকেই রয়েছে। একথা আজ স্পষ্ট, চুড়কার দুর্জয় লড়াই গ্রামবাসীদের প্রেরণার পাথেয় হয়ে আছে। স্থানীয় মানুষজন এভাবেই তাঁকে মনে রেখেছে।

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্বীকার করতে হয় যে সময়কালে চুড়কা মুর্মুর বলিদান সত্ত্বেও তাঁকে বীরগতিপ্রাপ্তির মর্যাদা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলেছে। অনেক মানুষজন, এমনকী ইতিহাসবিদেরাও তাঁকে তাঁর হৃতসম্মান ও স্বীকৃতি এতদিনে দিচ্ছেন। তবু কেন তিনি এব্যাপারে আজও সরকারি স্তরে স্বীকৃতি লাভ করলো না তা একটা রহস্য। এর কারণ কি এই যে, তিনি একজন স্বয়ংসেবক ছিলেন? এই কি তাঁর অপরাধ? অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পূর্বতন সঙ্ঘচালক তথা চুড়কার বন্ধু অরুণ মহন্ত বলেছেন, ‘তাঁর বলিদানের স্বীকৃতি ইতিহাসের পাতায় থাকলেও সরকারি খাতায় নেই’। আমরা অবিলম্বে এর অন্তর্ভুক্তি দাবি করছি। পরিশেষে বলি, তাঁর বলিদান ব্যর্থ হয়নি। তিনি আমাদের সামনে আত্মনির্ভর ভারতের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে থাকবেন, ছাত্রযুব সমাজের আদর্শ ও প্রেরণা হয়ে থাকবেন। তাঁকে আগামী প্রজন্ম স্মরণ করবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য)

দেশ ও ধর্মরক্ষায় বনবাসী সমাজ

শুকদেব টুডু

বহু প্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষ। বহু যুগ ধরে এই ভারতবর্ষ সাধুসন্ত ও অনেক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে। জন্ম দিয়েছে বহু দেশপ্রেমিকের যারা নিজের দেশ সমাজ ও ধর্ম রক্ষায় নিজেদের প্রাণ আহুতি দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ। সত্যে বিশ্বাসী। তাই তো সংস্কৃতে বলা হয়ে থাকে 'সত্যমেব জয়তে'। আজও ভারতবর্ষের বনবাসী সমাজ এই ধর্মে বিশ্বাসী। তাই তারা প্রকৃতির পূজারি। আজও তারা গাছ পাথরের পূজা করে। বহু প্রাচীনকাল থেকে আজও এই নীতি শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে আসছে।

বনবাসী সমাজ চিরদিনই নিজের দেশ ও ধর্ম রক্ষায় সদাই সচেষ্ট। তাইতো আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি দেশ ও ধর্ম রক্ষায় নিজেদের প্রাণ বলি দিতে। যেমন ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বিহারের ভাগলপুরে বাবা তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুখ্যাত দালাল অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড তিলক মাঝির তিরের আঘাতে প্রাণ হারান। যদিও ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীকালে এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য বিশাল বাহিনী পাঠায়। এই যুদ্ধে ৩৮৮ জন জনজাতি যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে।

তিলকা মাঝি তির-ধনুক দিয়েই ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে লড়াই করেন। যেখানে ইংরেজরা গোলাবারুদ বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছিল। এত অত্যাচারিত হওয়ার পরও তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত ভয় পেলো। নির্দয় ইংরেজরা বন্দি করে তিলকা মাঝিকে বটগাছে ঝুলিয়ে দেয়। মুখে কোনো আওয়াজ পর্যন্ত করলেন না। এরপর প্রতিশোধ স্পৃহায় ইংরেজরা বটগাছের সঙ্গে বেঁধে বুকে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে দিল। এইভাবে বাবা তিলকা মাঝি স্বাধীনতার বলিবেদীতে আহুতি দিলেন নিজের মাতৃভূমি রক্ষায়।

এরপর আমরা দেখি ১৮৫৫ সালে সিধু কানহু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ। যেখানে নিজের মাতৃভূমি ও ধর্মরক্ষায় প্রায় ১০ হাজার জনজাতি প্রাণ বলিদান দেন। অবশেষে সিধু কানহু ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আজও তাঁদেরকে স্মরণ করে ৩০ জুন জলদিবস পালন করা হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও জনজাতি সমাজ নিজের মাতৃভূমি রক্ষায় প্রাণ বলিদান দিয়েছে। তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চকরামপ্রসাদ গ্রামের চুড়কা মুর্মু। যিনি ১৯৫১ সালের ২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি সঙ্ঘের শাখায় যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ সম্পন্ন করেন। নিজের গ্রামে শাখা শুরু করেন এবং মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট পাকিস্তানি খানসেনারা মুক্তি ফৌজের ছদ্মবেশে ভারতে ঢুকে পড়ে। তাদের লক্ষ্য চকরামপ্রসাদ গ্রামের বিএসএফ ক্যাম্প দখল করা। এই গ্রাম দখল করতে পারলে জেলার সদর শহর বালুরঘাটে অনায়াসে আঘাত হানতে পারবে। পাকিস্তানি সৈন্যরা চকরাম গ্রামের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা ভীত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চকরাম শাখার মুখ্যশিক্ষক চুড়কা মুর্মু। গ্রামবাসীদের বোঝাল যে, দেশের এই বিপদে আমরা পালাব কেন? চল বিএসএফ ক্যাম্পে খবর দিই। কয়েকজনকে নিয়ে চুড়কা বিএসএফ ক্যাম্পে যায়। ক্যাম্পে তখন মাত্র ৪/৫ জন জওয়ান ছিল। তারাও প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জওয়ানরা বলল তাদের গুলির বাক্স বহন করার জন্য কয়েকজনকে চাই। কিন্তু কেউই মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সাহস করে এগিয়ে আসছে না। এইকথা শোনামাত্র চুড়কা এবং তার দুই বন্ধু গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়।

চুড়কার বন্ধুরা গুলির বাক্স মাথায় করে আর একজন জওয়ানের সঙ্গে গ্রামের দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। খুব শীঘ্র তারা একটা পুকুরের পাশে পাটখেতের মধ্যে উপস্থিত হয়। বিএসএফ জওয়ানটি একটি বড়ো গাছের পিছনে পজিশন নেয়। খান সেনারা জওয়ানকে ঘিরে ফেলে। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং পাক সৈন্যদের দ্বারা বন্দি হয়। পাটখেতের মধ্যে থেকে চুড়কা সব লক্ষ্য করেছিল। পাক সৈন্যরা ভারতীয় জওয়ানদের নিয়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় চুড়কা ভাবছে আমিও তাদের হাতে ধরা পরতে পারি। কিন্তু আমাদের গোলাবারুদ পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে কিছুতেই তুলে দেব না। তাই গুলির বাক্স পুকুরে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পাটখেতের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুলির বাক্স-সহ পুকুরের ধারে পৌঁছায়। আগের রাতে প্রবল বৃষ্টির জন্য পুকুরের ধার পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য গুলির বাক্স ছুড়ে ফেলতে গিয়ে তার পা পিছলে যায় পরিণামে বাক্স-সহ সেও পুকুরে পড়ে যায়। পুকুরের অন্যপাড়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আর একদল পাকিস্তানি সৈন্য চুড়কাকে দেখে ফেলে। তখন তারা নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে চুড়কার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। চুড়কা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। এমনিভাবে চুড়কা আরও অনেকের মতো বীরগতি প্রাপ্ত হয়।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাপতির আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। অনেক রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়। সঙ্ঘের শাখা থেকে চুড়কা শিক্ষা নিয়েছিল যে, ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে দেশ। এই দেশপ্রেমের সংস্কার তাকে দেশের সৈনিকে পরিণত করল। দেশের বিপদে দেশবাসীর কর্তব্য কী তা চুড়কা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে নিদর্শন রেখে গিয়েছে। ◘

স্বধর্ম ও স্বদেশ রক্ষায় উত্তরবঙ্গের জনজাতি সমাজের অবদান

তরুণ কুমার পণ্ডিত

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং হিন্দু সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে, এই সংগ্রামের অগ্নিশিখা আরও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বীর জাতির নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে যেমন এই লড়াইয়ের নায়ক ছিলেন বীরসা মুণ্ডা। তেমনি উত্তরবঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিতু সাঁওতাল। জিতু সাঁওতাল ছিলেন উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নেতা।

মালদা জেলার হবিবপুরের মঙ্গলপুরা গ্রামে তাঁর জন্ম। ছোটোবেলা থেকেই দেবদ্বিজে ভক্তি দেখে বাবা বীরেন হেমব্রম ও মা খুব খুশি ছিলেন। জিতু চেহারায় ছিল বেশ হোমরা চোমরা ও লড়াকু স্বভাবের। সত্যম শিবম বলে একটি ধর্মীয় সংস্থায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ইংরেজ আমলে বেশিরভাগ জমিদার ছিল মুসলমান। সেই জমিদাররা কথায় কথায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতো। নীলকর সাহেবরা এইসব জমিদারদের সাহায্য নিয়ে হিন্দু চাষীদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। জিতু তাদের মধ্যে সাহসী ও প্রতিবাদী হয়ে সাঁওতাল রাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। চাষীদের সংগঠিত করে ফসলের একটা অংশ কর হিসেবে দিতে অস্বীকার করে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে সে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে জিতুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এদিকে জিতু সাঁওতাল মালদা শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে আদিনা মসজিদে (আদিনাথ মন্দির) ঢুকে লৌকিক মতে শিবপূজা শুরু করেন। তার দাবি ছিল, আদিনা মসজিদ যে জমিতে তৈরি করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে শিবক্ষেত্র। একসময় এখানে আদিনাথ (শিবের) মন্দির ছিল। সেটি ধ্বংস করে তার উপরে আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রায় ৬০০ সাঁওতাল যোদ্ধা ১৯৩২ সালে আদিনা মসজিদ নিজেদের দখলে নেয়। দখল মুক্ত করতে আসে পুলিশ, শুরু হয় যুদ্ধ। একদিকে তির-ধনুক, তলোয়ার বল্লম, অন্যদিকে গুলি বন্দুক। এই যুদ্ধে পাঁচজন সাঁওতাল মারা যান, জিতু ও অন্যান্য সাঁওতালের তলোয়ারের আঘাতে দুজন পুলিশ মারা যায়। তৎকালীন জেলাশসক, জেলা পুলিশ সুপার ও বিশাল পুলিশ বাহিনী জিতুকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং ঘুষ দেওয়ারও চেষ্টা হয়। কিন্তু আদিনা মসজিদ পুলিশ ঘিরে ফেললেও স্বধর্ম রক্ষায় জনজাতি সাঁওতাল হিসেবে তিনি নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দু সরে আসেননি। শোনা যায়, ইংরেজদের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পাওয়ার লোভে গনিখান চৌধুরীর বাবা জিতু সাঁওতালকে আদিনা মসজিদের ভেতরে গুলি করে মেরে ফেলেন। একদিকে সাঁওতালদের যখন ইংরেজ সাহেবরা খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করতে বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করতো সেই সময়ে জিতুর এই আত্মত্যাগ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারায় জনজাতি সমাজকে ধরে রাখতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। *(পুনঃপ্রকাশিত)*

চুড়কা মুর্মু : সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

প্রকৃত বীরের প্রতি সম্মান জানানো হোক

১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট ৬০/৭০ জন পাকসৈনিক ভোর ৪টা ৩০ মিনিটের সময় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার সীমান্তবর্তী চকশ্যাম, চকদুর্গা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে অনুপ্রবেশ করে। এই সংবাদ পাবার পর সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ৭ জন তাদের বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হন। স্থানীয় যুবক চুড়কা মুর্মু স্বেচ্ছায় তাদের সাহায্য করার জন্য গুলির বাক্স বহন করে তাদের সহগামী হন।

আচমকা তারা একদল পাকসেনার মুখোমুখি হওয়ায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অগ্রবর্তী একজন সৈনিক পাক সৈন্যের হাতে ধরা পড়েন। চুড়কা মুর্মু ওই অগ্রবর্তী সৈনিকের সঙ্গে ছিলেন। চুড়কা মুর্মু হাতের গুলিভরা বাক্সটি পার্শ্বস্থ পুকুরে ফেলে দেয় যাতে গুলিভরা বাক্সটি পাকসৈনিকদের হাতে না পড়ে। তখন পাকসৈন্য তাকে ৫টি গুলি বিদ্ধ করায় শ্রীমুর্মু বীরগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমুর্মুর নির্ভীক আত্মদানে স্থানীয় জনসাধারণ গর্বিত। সরকারের উচিত শ্রীমুর্মুকে বীরত্বের জন্য মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করা এবং শোকাহত পিতামাতাকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য করা। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ উক্ত মর্মে নবনিযুক্ত রাজ্যপাল শ্রীডায়াস মহাশয়কে আবেদন করেছেন।

(সূত্র : স্বস্তিকা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ / পৃঃ ১১)

চুড়কা মুর্মুকে শহিদ ঘোষণার দাবি উঠল বালুরঘাটে

সুবীর মহন্ত (বালুরঘাট)

বীর কিশোর চুড়কা মুর্মুকে শহিদ ঘোষণার দাবিতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও চুড়কা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে স্মৃতিচারণা করা হলো। সোমবার বালুরঘাট শহর লাগোয়া চকরাম প্রসাদ গ্রামে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে চুড়কার বলিদান স্মরণ করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা নেতৃত্ব ও বিশিষ্টরা। ১৯ আগস্ট চুড়কার স্কুল জয়চাঁদলাল প্রগতি বিদ্যাচক্রে দুঃস্থ দু'জন ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। চুড়কা মুর্মু স্মৃতি রক্ষা সমিতির জেলা সদস্য উদয় শঙ্কর সরকার জানান, প্রতি বছর আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় চুড়কা মুর্মুর স্মৃতিচারণ করি। আমরা চাই সরকার চুড়কার বলিদানকে শহিদ ঘোষণা করুক এবং চুড়কার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ১৮ আগস্ট খানসেনারা বালুরঘাট শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে চকরামপ্রসাদ গ্রামে আক্রমণ করে। সেদিন ভোরে চুড়কা প্রতিদিনের মতো প্রাতঃকৃত্যের জন্য মাঠে গিয়েছিল। সে সময় খান সেনারা চকরামের দিকে ধেয়ে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে চুড়কা স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেয়। ইতিমধ্যে খান সেনাদের খবর জানাজানি হতেই গ্রামের লোকেরা পালাতে শুরু করে। চুড়কার মাস্টারমশাইও চুড়কাকে পালাতে বলে। কিন্তু চুড়কা সেদিন শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবেনি। মাত্র চার জন জওয়ানকে বুঝিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে। কিন্তু প্রায় ৬০/৭০ জন খানসেনার সামনে চার জন জওয়ান বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ফলে বিএসএফরা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু গুলির বাক্স মাথায় নিয়ে চুড়কা ভাবে এই সমস্ত অস্ত্র খান সেনাদের হাতে পড়লে তা দিয়ে তারা ভারতীয়দেরই মারবে। তখন সেই অস্ত্র ভরতি বাক্সটি পুকুরে ফেলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়। তখনি খানসেনারা তা বুঝতে পেরে তাকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়। সেখানেই বীর চুড়কার মৃত্যু হয়। কিন্তু এমন বীর কিশোর চুড়কার বলিদানের এত বছর পরেও জনজাতি ওই কিশোরের স্মৃতি রক্ষার্থে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিবছর ১৮ ও ১৯ আগস্ট চুড়কা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতি কাবাডি, তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, দুস্থ ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে চুড়কার সেদিনের সেই বলিদান স্মরণ করা হয়। চকরাম প্রসাদ গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি অবিলম্বে চুড়কা মুর্মুর এই আত্মবলিদানের সঠিক মর্যাদা দিতে সরকার চুড়কা মুর্মুকে শহিদ ঘোষণা করুক।

(উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৯ আগস্ট, ২০১৪)

চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদান দিবস পালন

বিএনএ, বালুরঘাট : সোমবার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরামপ্রসাদ গ্রামে চুড়কা মুর্মুর আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয়। চুড়কা মুর্মু স্মৃতি স্মারক সমিতি এই দিনটি পালন করে। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পাকিস্তানি সৈন্যরা সীমান্তবর্তী ওই গ্রামে ঢুকে পড়েছিল। সে সময় স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে কয়েকজন মাত্র বিএসএফ জওয়ান ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢুকে পড়ছে এই বিষয়টি চুড়কা মুর্মুর নজরে এলে তিনি বিএসএফকে খবর দেন ও তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। একটি গুলি বোঝাই বাক্স সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে চুড়কার মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই এদিনটিতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে দিনটিকে স্মরণ করা হয়। □

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু কীর্তিকলাপ

গত ১৫ জুনের স্বস্তিকা পত্রিকায় 'প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু কীর্তিকলাপ' শিরোনামে, বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা— মধুমিতা মান্নার দুর্নীতি প্রসঙ্গে নির্ভীক সংবাদ প্রকাশ করার জন্য স্বস্তিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন। আপনাদের সম্পাদিত পত্রিকার মাধ্যমে সমাজের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সেইসব দুর্বৃত্ত ও অসাধু চক্রের কুকীর্তি প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে, উন্নয়নের গতিকে অদৃশ্যভাবে পিছন থেকে আঘাত করে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে— এমন অপশক্তির প্রকৃত চেহারা জনসমক্ষে তুলে ধরা একটি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সাহসী সাংবাদিকতার পরিচয়।

'প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু কীর্তিকলাপ' শিরোনামে বর্তমান শিক্ষা অধিকর্তা মধুমিতা মান্নার দুর্নীতি প্রসঙ্গে আপনাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাধারণ মানুষকে যেমন সচেতন করেছে, তেমনই এমন অনিয়ম ও অপরাধের দিকে সমাজের রক্ষক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার দৃষ্টিও আকর্ষণ করছে। এর ফলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম হবে এবং সমাজে ন্যায়, স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আরও শক্তিশালী হবে— এই বিশ্বাস রাখি।

গণমাধ্যম কেবল সংবাদ পরিবেশন করে না; এটি সমাজের বিবেক হিসেবেও কাজ করে। সত্যকে নির্ভয়ে তুলে ধরা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত আপনাদের পত্রিকা স্থাপন করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

আশা করি, ভবিষ্যতেও আপনারা একই নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সবরকম সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে যাবেন এবং একটি সুস্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

অপানাদের এই নিরলস প্রচেষ্টার জন্য আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা রইল।

—অসিত বিশ্বাস, সোমা বিশ্বাস,
কলকাতা-২৬।

দেশ বিরোধী আন্দোলন ও দেশ ভক্ত সরকার

ভারতীয় জনতা পার্টি দেশকে শক্তিশালী করতে চায়। দেশ নড়বড়ে থাকলে বাস্তুঘুঘুদের সুবিধা। তখন ঘোলা জলে মাছ ধরতে অসুবিধা থাকবে না। এরাই 'মিলিটারি সিক্রেসি' নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা চায় কী জন্য? দেশের স্বাধীনতার পর ধনসম্পদশালী ভারত জননীকে যারা গোটা বিশ্বের সামনে ভিখারিণী করে তুলে ছিল, ১৯৪৭-এর পর তারাই এই দেশ শাসন করেছে টানা ছয় দশক। চালিয়েছে অবাধ লুঠতরাজ। ফলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি পিছিয়ে গিয়েছে। পুরুষের পরিচয়ের পার্থক্য থাকে। অনেকে ভাবেন নিজেদের যেমন পরিচয় অন্যেরটাও যেন তেমন হোক। আমরা ঋষিপুত্র বলে গান গাই। আমাদের গোত্রের পরিচয় আমাদের অতীত গৌরব। কংগ্রেস, বামপন্থী সমেত বিরোধীরা আমাদের অতীত গৌরবের কথা জানতে দিতে চায় না। যে পরিবারের অতীত গৌরব নেই, তাদের পারিবারিক শিকড় শক্তপোক্ত নয়। শিকড় থাকলেও কচুরিপানা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। বট বা অশ্বত্থ কি তাই? হাজার ঝড়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বটবৃক্ষ। 'হিন্দুত্ব' ঠিক তাই। হাজার হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে বর্তমান। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি একে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা বার বার করে এসেছে। বহু সনাতনী মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের রক্ত ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আজ কেন্দ্রে ও আশি শতাংশ রাজ্যে সনাতনী সরকার রয়েছে। এটা কি করে সহ্য হয় এইসব দেশ বিরোধী শক্তির?

আজ পর্যন্ত কোনো বিরোধী দল দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের কোনো প্রস্তাব জমা দেয়নি। এরাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আওয়াজ তুলেছিল যে বিজেপি ৩৫০ আর এনডিএ ৪০০ আসন পেলে দেশের সংবিধান পরিবর্তন করে দেবে। পরিবর্তন ও সংশোধন শব্দ দু'টি কি এক? বিগত দশকে কংগ্রেস বার বার ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করেছে। তারাই ভারতীয় সংবিধানের 'দেশ পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of the State Policies)' অগ্রাহ্য করে, তৎকালীন বিরোধীদের জেলে পুরে অবৈধভাবে, চরম অগণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' পর্যন্ত পরিবর্তন করে। তাদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা ও বর্তমান রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বিপ্রতীপে রাষ্ট্রভক্তদের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে একাধিক সংবিধান সংশোধনীর পরিকল্পনা করেছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। আর এতেই ক্ষেপে গিয়েছে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত সংবিধান সংশোধনীসমূহ দেশকে সর্বাত্মক উন্নতির পথে পরিচালিত করবে— শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই একথা জানেন।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

ককরোচ জনতা পার্টি—নেপথ্যে কারা?

প্রতিবাদের আড়ালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, উঠছে একাধিক প্রশ্ন। দেশের রাজনৈতিক পরিসরে কোনো আন্দোলন, কোনো সংগঠন বা প্রতিবাদকে ঘিরে যখন একের পর এক বিতর্ক তৈরি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে— এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? কারা এর নেপথ্যে

ফঃ ৩

রয়েছে? আর এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই তথাকথিত 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি-কে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির একাংশের সঙ্গে এই সংগঠনের কথিত যোগাযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠছে। অনেকের অভিযোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষকে এক ছাতার তলায় এনে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বিরোধী শক্তির রাজনৈতিক বক্তব্য, সামাজিক মাধ্যরে প্রচার ও বাস্তব তথ্য— এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সাংসদ, বিধায়ক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রকাশ্যে কোনো বিতর্কিত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন বা সামাজিক মাধ্যমে সেই যোগদানের প্রচার করেন— তাহলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে? নাকি রাজনৈতিক সুবিধার কারণে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নে উত্তর রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকেই আসা উচিত। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো--- দেশে অরাজকতা সৃষ্টিকারী কোনো আন্দোলনকে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত না করে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থের উৎস, সাংগঠনিক কাঠামো এবং নেপথ্যে ক্রিয়াশীল শক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। যদি সত্যিই কোনো সংগঠন দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব বা সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই তথ্য-প্রমাণ ও আইনের ভিত্তিতে হতে হবে, রাজনৈতিক অনুমান বা গুজবের ভিত্তিতে নয়। একমাত্র তাহলেই আইনের চোখে এই নৈরাজ্যবাদী শক্তি 'দোষী' সাব্যস্ত হবে, নচেৎ নয়।সম্প্রতি বিভিন্ন আন্দোলনকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' ছড়িয়ে পড়ছে। বিদেশি শক্তির অর্থায়ন থেকে শুরু করে সাগরপার থেকে 'রিমোট কন্ট্রোল'-এ এইসব আন্দোলন পরিচালনার নানা অভিযোগও সামনে আসছে।

কিন্তু এরকম গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে আবেগ নয়, প্রয়োজন নিরপেক্ষ তদন্ত। যদি সত্যিই কোনো বিদেশি শক্তি ভারতে কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ এই অস্থিরতা তাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করে, তাদের লক্ষ্য যদি হয় এহেন অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতে 'রেজিম চেঞ্জ'— তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দায়িত্ব সেই ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করা এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া।

দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রতিবাদের অধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই দেশের অখণ্ডতা ও সাংবিধানিক কাঠামো রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনো আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে দেখতে হবে— সেখানে সত্যিই দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো বিপদ রয়েছে কিনা। থাকলে কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে, আর না থাকলে রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করা আইনত উচিত নয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হলো— গুজব নয়, সত্য সামনে আসুক। রাজনৈতিক প্রচার নয়, নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।

'ককরোচ জনতা পার্টি'র নামে যেসব রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বা অভিযোগ সামনে আসছে, তার প্রকৃত সত্যতা তদন্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া জরুরি। যদি এর পিছনে কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকে, তবে সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা হোক। আর যদি অভিযোগের ভিত্তি না থাকে, তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশের জনগণের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা হোক। কারণ, দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার প্রশ্নে কোনোরকম আপোশ করা যায় না। কিন্তু একইসঙ্গে গণতন্ত্রের ভিতও যেন রাজনৈতিক অভিযোগ ও অপপ্রচারের চাপে দুর্বল না হয়— সেটিও নিশ্চিত করা জরুরি। দেশের স্বার্থে তাই এখন প্রয়োজন হলো--- শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা নয়, তদন্ত পরিচালনা; গুজব নয়, তথ্য-প্রমাণ সামনে নিয়ে আসা; রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়— আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগনা।

নেতাজী সম্পর্কে কটূক্তি কি মেনে নেওয়া যায়?

যে ব্যক্তিত্বের বীরত্ব, শৌর্য, দেশপ্রেম, দূরদৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার জন্য আজও দেশের কোটি কোটি মানুষ শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্তে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করেন, পূজা করেন, ভারতবাসী-সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যাঁকে 'নেতাজী' অভিধায় ভূষিত করেছে— তাঁর মতো প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবকে যারা মসীলিপ্ত করতে চায়, সমগ্র দেশবাসী কি তাদের মতো নরাধমকে ক্ষমা করবেন?

কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা তাঁর মহানিষ্ক্রমণের পর থেকে তাঁর সূর্যের মতো উজ্জ্বল কর্মজীবনকে আজও কালিমালিপ্ত করতে দ্বিধা করে না। অবশ্য তার উপযুক্ত মূল্যও তারা পেয়েছে। হয়তো আরও রাজনৈতিক মূল্য তাদের চোকাতে হবে। এরাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিরও কিন্তু এই বিষয়টি ভেবে দেখবার সময় এসেছে। কোনো ব্যক্তি নিজেকে 'মহারাজা' ভেবে দিবাস্বপ্ন দেখতেই পারেন। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে তার মূল্য কতটুকু— এই ধরনের অর্বাচীনদের তা ভেবে দেখা উচিত।

শুনেছি কিছু লোক একজনকে 'মহারাজ' ভাবেন এবং তিনিও নিজেকে তাই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তদুপরি তিনি সর্বদা প্রচারের আলোতে ভেসে থাকার জন্য মাঝে মাঝেই এই ধরনের উক্তি করতে অভ্যস্ত। এর আগেও তিনি তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। শুনেছি ভারত সরকারের কাছে তার মূল দাবি— ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোচবিহার জেলাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তাকেই করতে হবে সেই সার্বভৌম দেশের একচ্ছত্রাধিপতি। শুনেছি এই স্বপ্নে তিনি এখনও বিভোর। তবে বাক্-সংযমের ব্যাপারটা মাথায় রাখলে ভালো। নইলে আইন ও সময় কিন্তু ক্ষমা করবে না।

—বিনয়কৃষ্ণ দাশ,
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

নারী স্বনির্ভরতা ও ক্লাউড কিচেন পলিসি

সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়

আমাদের সমাজব্যবস্থা আগে ছিল এক পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অধীন, বর্তমানেও কিছু কিছু পরিবারে একই চিত্র দেখা যায়। নারীরা বিয়ের পর মুখ বুজে সংসার সামলাবে— এটাই তাঁদেরকে বোঝানো হয়। বাইরের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা বা আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করার ভাবনা যে তাঁদের কাছে বাতুলতা তা তাঁরা ভালোই জানতো। তবে ব্যতিক্রমও অনেক পরিবারে দেখা যায় বর্তমানে মেয়েরা স্কুলে-কলেজে চাকরি করে অর্থোপার্জন করে এবং স্বাবলম্বনের রাস্তা খুঁজে নেয় সম্মানের সঙ্গে।

আমরা সকলেই জানি, অর্থই সমাজের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু সেই সামান্য অর্থের জন্য যদি নারীদের স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় তবে তাঁদের আত্মসম্মান যায় তলানিতে। তাই বর্তমান সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি নতুন পলিসির কথা পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের কাছে উত্থাপন করেছেন, যার নাম 'ক্লাউড কিচেন' পলিসি। নারীরা তাঁদের রন্ধন শিল্পকে কাজে উত্থাপন করেছেন, যার নাম 'ক্লাউড কিচেন' পলিসি। নারীরা তাঁদের রন্ধন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। এটি একটি ক্ষুদ্র পুঁজির প্রকল্প। এর মাধ্যমে মেয়েরা তাঁদের রন্ধনশিল্পের পটুত্বের যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। 'ক্লাউড কিচেন' পলিসিতে বলা হয়েছে এর জন্য কোনো দোকানঘর ভাড়া করতে লাগবে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিজস্ব রান্নাঘর, স্টোরেজব্যবস্থা, সুস্বাদু খাবার ও সময়মতো খাবার ডেলিভারি দেওয়া প্রতিদিন— এগুলিকে মাথায় রেখে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে— তবেই সাফল্য আসবে নিশ্চিত। তবে সব থেকে আগে প্রয়োজন নিজের এলাকাকে ভালোভাবে জানা আর সেখানেই প্রথম প্রচার কার্য চালানো। পরবর্তীকালে লিফলেট বা হোওয়াটস্যাপ বা ফেসবুক-এর মাধ্যমে খাবারের দাম সমেত প্রচার করতে হবে যা এই ব্যবসাকে সুদূরপ্রসারী সাফল্য এনে দেবে। বর্তমান যুগ দ্রুত গতির যুগ এবং যাঁরা কর্মরত বা যাঁরা মেস ভাড়া করে থাকে তাঁরা কম খরচে সুস্বাদু খাবারেরও আস্বাদ পেতে চায়। সেক্ষেত্রে মেয়েরা যদি এই ব্যবসায় এগিয়ে আসে স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নিয়ে তবে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে যার কর্ণধার বর্তমান সরকার। কেই বা বলতে পারে, আজ থেকে পাঁচ বছর বাদে এই ক্ষুদ্র মহিলা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কেউ বৃহত্তর বিনিয়োগের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, যে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটালেন আমাদের সরকার।

একথা অনস্বীকার্য যে, 'নারী তুমি অনন্যা, তুমি-ই দশভুজা, আবার তুমি-ই কোমলময়ী মাতা'; যিনি নিজেকে আর্থিক দিক থেকে সক্ষম করে একটি সংসারকে সুদক্ষতার সঙ্গে সামলান নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে। তাই তুমি শ্রেষ্ঠ। □

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ফিরে পাবেন শ্রবণশক্তি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শ্রবণশক্তি হ্রাসের অন্যতম কারণ শব্দদূষণ। শহর ও শিল্পাঞ্চলের এই দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের কানের সহনীয় শব্দযাত্রা ৫০-৫৫ ডেসিবেল। কিন্তু এই মাত্রা ৮৫ ডেসিবেলের বেশি হলে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অথচ আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় শব্দমাত্রা প্রায় ৯০-১১০ ডেসিবেল, যা কানের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে রাস্তায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ, দোকানদার, হকার, পথচারী, বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের কানের ক্ষতি হয় বেশি।

শ্রবণশক্তি হ্রাসের প্রভাব ঃ শ্রবণশক্তি হারালে অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। যেমন- শ্রবণশক্তি হারানো মানে কোনো কিছু না বোঝা এবং বিভিন্ন কথাবার্তায় শব্দের পার্থক্য করতে না পারা। কারও শ্রবণশক্তি হারালে এবং তার চিকিৎসা না করালে বা বিলম্ব করা হলে ওই ব্যক্তিটির জানার ক্ষমতা, ভাষার দক্ষতা ও সার্বিক বিকাশ কমে যায়। ভাবপ্রকাশ করার ক্ষমতা কমে যাবার পাশাপাশি তার বৃদ্ধি কমে যায় ও মানসিক ত্রুটি দেখা যায়। শ্রবণশক্তি হারানো মানুষকে বিচ্ছিন্ন, দুর্বল, একাকী করে দিতে পারে।

শ্রবণশক্তি হারানোর কারণ : কম ওজন নিয়ে জন্ম, বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া, নবজাতকের জন্ডিস ইত্যাদি রোগ। মায়ের গর্ভকালীন কিছু সংক্রমণ যেমন— সাইটোমেগালো ভাইরাস, রুবেলা। শিশুর মেনিনজাইটিস, মাম্পস, মিজেলাস, মধ্যকর্ণের সংক্রমণ ইত্যাদি। ব্যাক্টেরিয়া অথবা ভাইরাস সংক্রমণ। দীর্ঘদিন উচ্চ শব্দপূর্ণ পরিবেশে থাকা বা কানের জন্য ক্ষতিকর ভলিউমে শোনা। কানে ফাংগাল ইনফেকশন বা ময়লা জমা হয়ে কান বন্ধ হয়ে যাওয়া। এছাড়াও কানে আঘাত, বংশগত কারণ, কানের জন্য ক্ষতিকর কিছু ওষুধ প্রয়োগ, দীর্ঘ ফোনালাপ, কান বা ব্রেন টিউমার, হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত বা আতসবাজির শব্দ, বার্ধক্যজনিত কারণ ইত্যাদি শ্রবণশক্তি হারানোর কারণ।

বিশ্বে ৩২ কোটি শিশুর শ্রবণশক্তি হ্রাস হয়। সময়মতো চিকিৎসা নিলে এই শিশুদের বেশির ভাগেরই শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। শৈশবে শ্রবণশক্তি হারানোদের ৬০ শতাংশই প্রতিরোধযোগ্য যাঁরা শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন তাঁরা প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারেন। এরজন্য হিয়ারিং এইড, শল্যচিকিৎসা-সহ অনেক চিকিৎসা রয়েছে।

প্রতিরোধে করণীয় ঃ শ্রবণশক্তি হ্রাস ঠেকাতে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

গর্ভকালীন অবস্থায় মায়ের যত্ন নেওয়া এবং সময়মতো রুবেলা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি টিকাগুলো দেওয়া। এই সময় অটোটক্সি বা শ্রবণে ক্ষতিকারক ওষুধ গ্রহণে বিরত থাকা। জন্মের প্রথম দিন বা ছয় মাসের মধ্যে শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করা উচিত। একে বলে ইউনিভার্সাল হিয়ারিং স্কিনিং। এরপর শিশুটির দাঁত ওঠা, হাঁটা-চলা পাশাপাশি শব্দের প্রতি সাড়া দিচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা উচিত। প্রতি ছয় মাস পর পর কানের পরীক্ষা করা দরকার। কোনো সমস্যা ধরা পড়লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়া উচিত। দেড় থেকে দুই বছরের মধ্যে শিশু কথা না বলতে পারলে অর্থাৎ ডিলেইড ডেভেলপমেন্ট অব স্পিচ পরিলক্ষিত হলে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি মাধ্যমে জন্মগত ত্রুটি দূর করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের অনেক হাসপাতালে তা হচ্ছে।

ব্যাক্টেরিয়া অথবা ভাইরাস সংক্রমণ, কানে ময়লা জমা হয়ে কান বন্ধ হয়ে গেলে, কান পেকে গেলে এবং কানে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী কনজারভেটিভ বা সার্জিকাল ট্রিটমেন্ট নেওয়া। কানে কোনো কিছুই ঢোকানো উচিত নয়। এমনকী কান পরিষ্কার করার জন্য কাঠি, তেল, মুরগির পালক বা কটন বাস্ত ব্যবহার করারও প্রয়োজন নেই। কানে যাতে জল না ঢোকে, সে ব্যাপারে সব সময় খেয়াল রাখা উচিত।

লাউডস্পিকারে উচ্চ শব্দ না শোনা, দীর্ঘক্ষণ হেডফোন ব্যবহার না করা ও কলকারখানার শব্দ সহনীয় মাত্রায় রাখা উচিত।

গাড়িচালকদের অযথা হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা উচিত। শিশুদের টনসিল বা অ্যাডিনয়েড, সাইনাসের সংক্রমণ, নাক ও গলার অ্যালার্জি ইত্যাদি হলে দ্রুত চিকিৎসা করানো উচিত।

কানে জোরে আঘাত করা, বিশেষ করে শিশুদের কানে চপেটাঘাত থেকে বিরত থাকা উচিত। শ্রবণশক্তি নিয়মিত পরীক্ষা করান। বিশেষ করে যাঁরা কলকারখানায়, কলসেন্টারে কাজ করেন, তাঁরা ছয় মাস অন্তর শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করান। একনাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ উচ্চমাত্রায় মোবাইলে কথা বলা উচিত নয়। স্নায়ুগত কারণে যাদের শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছে, তাদের অবশ্যই মোবাইল ফোন পরিহার করা উচিত। কেননা ফোনসেট থেকে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় ওয়েভ বা আবেশের কারণে এবং শব্দমাত্রা ও ব্যবহারের মেয়াদকাল অনুযায়ী কানের ক্ষতি হতে পারে। তাই প্রয়োজনে লাউডস্পিকার ব্যবহার করুন বা এসএমএস চালাচালি করুন। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগ, যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বধিরতা প্রতিরোধ ও নিরাময়ে চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, শ্রবণযন্ত্র, ককলিয়ার ইমপ্লান্ট-সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ঃ মায়াজম, কারণ ও রোগের লক্ষণ মিলিয়ে চিকিৎসা করলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব। তবে সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে কল্যাণ ভবনে জনজাতি বিধায়কদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

'জনজাতি সমাজের সেবা এবং তাঁদের সাংবিধানিক ও সংরক্ষিত অধিকার রক্ষা ও বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে একজন বিধায়ক হিসেবে কাজ করার আপনি যে শুভ সুযোগ পেয়েছেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তা আপনি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করবেন।' পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৭ জুলাই কলকাতার মানিকতলা স্থিত কল্যাণ ভবনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় তফশিলি জনজাতি আসন থেকে নির্বাচিত ১৭ জন বিধায়কের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে একথাগুলি বলেন অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সভাপতি শ্রী সত্যেন্দ্র সিংহ।

জনজাতি ঐতিহ্য অনুসারে আগত বিধায়কদের পদপ্রক্ষালন করে সম্মান জানিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করানো হয়। এই আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী অভ্যর্থনায় উপস্থিত সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফশিলি জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু-সহ সকলেই এই অনন্য আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী অতুল জোগ, জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সংযোজক ডঃ রাজকিশোর হাঁসদা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ভগবান শ্রীরাম, ভারতমাতা, ভগবান বীরসা মুণ্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিধায়কদের কুমকুম তিলক, উত্তরীয়, চারাগাছ, স্মারক উপহার এবং ভগবান শ্রীরাম-মহাবীর হনুমানের মিলনমূর্তি প্রদান করা হয়। প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী সুশীল সোরেন পশ্চিমবঙ্গে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিচয় তুলে ধরেন। তিনি জানান, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন ও জনজাতি সমাজের অধিকার রক্ষায় প্রায় এক হাজার স্থানে আশ্রমের বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সরকারের সহযোগিতা পেলে এই উন্নয়নমূলক কাজ আরও গতি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত বিভিন্ন সেবাপ্রকল্পের বিবরণ দান করেন।

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সমন্বয়ক ডঃ রাজকিশোর হাঁসদা তাঁর ভাষণে সনাতন হিন্দুধর্ম ও জনজাতি সংস্কৃতির গভীর সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি জনজাতি সমাজকে তাদের মূল সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করেন। তিনি সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশাল জনজাতি সম্মেলনের উল্লেখ করেন এবং জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের চলমান আন্দোলনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপস্থিত বিধায়করা তাঁদের বক্তব্যে আশা প্রকাশ করেন যে, জনজাতি সমাজ ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় ও সংলাপ বৃদ্ধিতে কল্যাণ আশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু বলেন, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং চলমান সেবাকাজ রাজ্য সরকারের কাজেও সহায়ক হবে। তিনি আশ্রমকে নতুন নতুন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সরকারের কাছে উপস্থাপনের আহ্বান জানান এবং সেগুলিকে স্বাগত জানানোর আশ্বাস প্রদান করেন।

'নগরবাসী-গ্রামবাসী-বনবাসী— আমরা সবাই ভারতবাসী' এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া এই অনুষ্ঠানে কল্যাণ আশ্রমের প্রান্তীয় পদাধিকারী, মহানগর সমিতির পদাধিকারী -সহ ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সুমধুর স্বাগত সঙ্গীত, বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত, ভব্য আয়োজন এবং আন্তরিক আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি এক গৌরবময় ও স্মরণীয় রূপ লাভ করে।

অনুষ্ঠানের শেষে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সভাপতি ডাঃ চুনারাম মুর্মু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’-শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১৫ জুলাই ‘অন্তর্বোধ ফাউন্ডেশন’-এর উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬ : বাঙ্গালির নিজস্ব ফাস্ট ফুড’-শীর্ষক একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’ হলো অন্তর্বোধ ফাউন্ডেশন সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত একটি উৎসব-আধারিত উদ্যোগ। এই অনন্য রন্ধনশিল্প ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং এই উদ্যোগের রূপকল্প উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’-এর চিফ প্যাট্রন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক) স্বামী বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজ, সোনারপুর (উত্তর) বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’ উৎসব সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশিস ধর এবং বিএল এডুকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (কোচবিহার)-এর অধ্যাপক ও ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’ উৎসব সমিতির জয়েন্ট চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিষ্ক রঞ্জন সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’ উৎসবের উপদেষ্টা শ্রী অরিন্দম রায়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দাবিসমূহ উত্থাপিত হয়। অন্তর্বোধ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রাজ্যে ‘হালাল’ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয় যে, এবিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬’ নামে একটি উৎসবের আয়োজন তাঁরা করবেন। যেখানে ‘পলান্ন’ বানানোর একটি প্রতিযোগিতা হবে। উল্লেখ্য, ‘পলান্ন’কে বিধর্মীরা ‘বিরিয়ানি’ নামকরণ করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, প্রতিযোগীরা স্বল্প মূল্যের ‘এন্ট্রি ফি’-র মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। সেরা রন্ধনশিল্পী বা রাঁধুনিদের নিয়ে কলকাতায় একটি চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে জয়ীকে দেওয়া হবে একটি চার চাকার গাড়ি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন এই উৎসবের ‘চিফ প্যাট্রন’ স্বামী বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজ জানিয়েছেন— ‘‘প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই হালাল করা মাংস বা ওই জাতীয় কোনো কিছুই ব্যবহার করা যাবে না। আমরাই সমস্ত কিছু সরবরাহ করব। এই প্রতিযোগিতা হলো ‘ঝটকা বিরিয়ানি’ বানানোর প্রতিযোগিতা। তবে বিরিয়ানি শব্দটি কোথাও থাকবে না। এই উৎসবের নাম— পলান্ন উৎসব।” উৎসব সমিতির চেয়ারম্যান, প্রাক্তন পুলিশকর্তা ও বর্তমান বিধায়ক দেবাশিস ধর বলেন— ‘এটি হালাল-বিরোধী একটি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে বঙ্গীয় সংস্কৃতি তুলে ধরতে চাইছি। কারণ, বিভিন্ন বিদেশি শক্তির আক্রমণে বাঙ্গালির খাদ্যাভ্যাস বদলে গিয়েছে। এমনকী বদলে গিয়েছে বঙ্গসংস্কৃতি। আমাদের উদ্দেশ্য প্রকৃত বঙ্গসংস্কৃতি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।’ এরাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে এই উৎসব হবে বলে এদিন জানানো হয়েছে। তিনদিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে একদিন বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনও থাকবে বলে এই উৎসবের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। স্থানীয় স্তরে যে প্রতিযোগিতা হবে সেখানেও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। উৎসব সমিতির জয়েন্ট চেয়ারম্যান অধ্যাপক জ্যোতিষ্ক রঞ্জন সরকার বলেন--- ‘আমাদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের নামে বাঙ্গালি জাতিকে বিভ্রান্ত ও অন্যদিকে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছে। এটি আমাদের পক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।’ বঙ্গীয় খাদ্য ঐতিহ্য, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সচেতন ভোক্তা-সংস্কৃতিকে সামনে রেখে এদিন অন্তর্বোধ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ‘বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬— এ নন-হালাল মুভমেন্ট’ আয়োজনের ঘোষণা করা হয়। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য— পশ্চিমবঙ্গে দেশীয় খাদ্যসংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, স্থানীয় কৃষক ও নারী উদ্যোক্তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন এবং একটি স্বচ্ছ ও বিকল্প খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার। স্বামী বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজের প্রেরণায় ও বিধায়ক দেবাশিস ধরের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এই কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব পাবে গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঁজি প্রভৃতি দেশীয় চাল, ঐতিহ্যবাহী বাঙ্গালি খাদ্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীসমূহ, মহিলাদের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন খাদ্য সরবরাহ উদ্যোগ ও গ্রামীণ কৃষিপণ্য উৎপাদকদের বাজার সংযোগ। আয়োজকদের মতে, এটি কেবলমাত্র একটি 'খাদ্য উৎসব' নয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচয়, আত্মনির্ভর অর্থনীতি এবং ভোক্তার স্বাধীন পছন্দের অধিকারকে সামনে এনে একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস।

খাদ্য পর্যটন, ঐতিহ্যভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি, স্থানীয় ব্র্যান্ড উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। অন্তর্বোধ ফাউন্ডেশন জানিয়েছে যে, কর্পোরেট সংস্থা, সিএসআর অংশীদার, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা ও সাধারণ নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'বাঙ্গলার পলান্ন, ২০২৬' বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গৌরব ও অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা' বিষয়ক আলোচনাচক্র

গত ২৮ জুন 'বাগুইআটি সৃজনী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে বাগুইআটিতে প্রতিবেশী সঙ্ঘের সভাঘরে আয়োজিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা' বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র। শিল্পীদের কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-সহ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানমঞ্চে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন বাগুইআটি সৃজনী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সভানেত্রী শ্রীমতী শ্যামলী দাস। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জৈবপ্রযুক্তিবিদ ড. সুতনু সামন্ত ও জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিনের আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমনাথ চক্রবর্তী ও বাগুইআটি সৃজনী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সম্পাদিকা শ্রীমতী সঞ্চিতা বাগ মাইতি। বক্তাদের কণ্ঠে এদিন উপস্থাপিত হয় রক্তাক্ত দেশভাগ এবং বঙ্গবিভাজনের মাধ্যমে 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির ইতিহাস। তাঁরা বলেন যে, ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে ২০ জুন তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে বঙ্গ বিভাজনের দ্বারা বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ'। সেই সময় থেকেই ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত ৭৯ বছর ধরে এই ইতিহাস বাঙ্গালি তথা ভারতীয়দের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষটি ছিল পরিপূর্ণ। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

গাজোল মহাবিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ— একটি পরিচয়' শীর্ষক আলোচনাসভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১৫ জুলাই মালদা জেলার গাজোল মহাবিদ্যালয়ের গীতাঞ্জলি আলোচনা কক্ষে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ—একটি পরিচয়' শীর্ষক এক গম্ভীর, তাৎপর্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর মা সরস্বতী বন্দনা এবং বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভাকক্ষে এক গম্ভীর, সুশৃঙ্খল ও ভাবময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মনোজ কুমার ভোজ। সভাপতির ভাষণে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকদের আত্মনিবেদিত, ত্যাগময় ও সংঘর্ষপূর্ণ জীবনের নানাদিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সঙ্ঘের প্রচারকদের জীবন কেবল একটি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থোপার্জন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আজীবন দেশ, জাতি ও সমাজের সেবায় আত্মোনিয়োগ করেন। নানা প্রতিকূলতা, সামাজিক সংকট ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও তাঁরা আদর্শ, শৃঙ্খলা ও সেবার ব্রতকে অটুট রেখেছেন। এই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সমর্পণের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনুকরনীয় এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। তিনি তাঁর প্রাঞ্জল, যুক্তিনির্ভর ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যে সঙ্ঘের শতবর্ষের ঐতিহাসিক যাত্রা, প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আদর্শ, ব্যক্তি নির্মাণ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের দর্শন, জাতীয় চরিত্র নির্মাণ, সাংস্কৃতিক ঐক্য, স্বেচ্ছাসেবার আদর্শ এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আত্মনিবেদিত সেবাভাব, শৃঙ্খলা, চরিত্রগঠন ও জাতীয় চেতনার বিকাশই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের মালদা বিভাগ কার্যবাহ অধ্যাপক শ্যামল পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে সঙ্ঘ স্থাপনার পটভূমি, বিকাশ এবং সমাজজীবনে সঙ্ঘের ভূমিকার কথা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেন।

আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের মালদা সহ-জেলা কার্যবাহ দিলীপ সরকার, গাজোলের স্বয়ংসেবক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল কুমার কুণ্ডু, শচীন রায়, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, আদিত্য মণ্ডল, বিপুলবন্ধু বাগচী, এবিআরএসএমের জেলা সম্পাদক ডঃ তন্ময় পোদ্দার প্রমুখ। গাজোল মহাবিদ্যালয়ের দশটি বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় বহু স্বয়ংসেবক আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্যের শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বক্তারা।

আলোচনাসভার সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক তথা এবিআরএসএমের মালদা জেলা সভাপতি ডঃ নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী। সভার প্রতিটি পর্বকে সুসংহত ও প্রাণবন্ত করে সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অনিমেষ মণ্ডল। তাঁর সুচারু সঞ্চালনা সভার মর্যাদা ও সৌন্দর্যকে এক অনন্য উচ্চতা প্রদান করে। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বিষ্ণুপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই ভারত সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা ‘মেরা যুব ভারত, বারুইপুর’-এর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত সামালীতে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিল ‘নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি’। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে স্বদেশ ব্যান্ড। অনুষ্ঠানে অঙ্কন, দেশাত্মবোধক আবৃত্তি এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর উপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের উপর ‘দেশলোক’ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক হালদার, নীতীশ মণ্ডল, সজল আদক, অমর ঘোষ, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচুগোপাল মাজী প্রমুখ বিশিষ্টজন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রিয়ম গুহ।

বীরভূম মহাবিদ্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিপক্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

বীরভূম মহাবিদ্যালয়ে ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিপক্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। ৬ জুলাই পালিত হয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জন্মদিবস। এদিন বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজসেবী সায়ন্তন বসু এবং সিউড়ী শহরের প্রবীণ নাগরিক ও সমাজসেবী নির্মল চন্দ্র মণ্ডল।

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ডঃ কাকলী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অভ্যন্তরীণ ও গুণমান নিশ্চিতকরণ সেল এবং ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম, ইউনিট ১ ও ২-এর সহযোগিতায় এবং সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী,অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও প্রশাসনিক সহায়কদের উপস্থিতিতে সমস্ত অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিপক্ষে মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকার ঘোষিত অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর নগরের বনদেবী শাখার স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে ১৯ জুলাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তন কর্মসূচির অন্যতম পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতার বার্তা দিতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ফ ঃ ৪

দমদমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় রথযাত্রা মহোৎসব

সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে গত ১৬ জুলাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (উত্তর কলকাতা জেলা)-এর উদ্যোগে দমদমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হলো শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পবিত্র রথযাত্রা উৎসব। এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (উত্তর কলকাতা জেলা)-এর পরিচালনায় এবং দমদম পরশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র সহযোগিতায় আয়োজিত এই ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অসংখ্য সনাতনীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমগ্র পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে। মহাপ্রভুর রথের রশিতে টান দিয়ে ভক্তরা তাঁর আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই মহোৎসব সনাতন হিন্দুধর্মের ঐক্য, সেবা, ভক্তি ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক অনন্য প্রকাশ হয়ে ওঠে।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ বিশ্বজিৎ দাঁ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ ও দমদম পরশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র কার্যকর্তা জয়দীপ সাহার উপস্থিতিতে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয় রথযাত্রার আয়োজন। তাঁদের উপস্থিতি সমবেত ভক্তবৃন্দ-সহ পরিষদের কার্যকর্তা-কার্যকর্ত্রী এবং রথযাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও সাংগঠনিক শক্তির সঞ্চার করে।

দমদমে সম্মিলনী ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে এদিন রথযাত্রার শুভারম্ভ হয়। রথে আসীন ছিলেন দেবত্রয়ী— শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও মাতা সুভদ্রা। রথের যাত্রাপথটি ছিল--- সম্মিলনী ক্লাব- লালবাগান- অঞ্জনগড়- দমদম রোড সেন্ট মেরিজ্ স্কুল- লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির-শ্রীহনুমান মন্দির-ছাতাকল মোড়-প্রাইভেট রোড। গত ২৪ জুলাই 'উল্টোরথ' অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্মিলনী ক্লাব প্রাঙ্গণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সকল সনাতনীদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর সকলের এবং ধর্ম সকলকে একসূত্রে বাঁধে। প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সেবা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শেই গড়ে ওঠে সুসংগঠিত সমাজ ও শক্তিশালী জাতি। পরম ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর আশীর্বাদে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই সনাতনী সংস্কৃতির এই মহোৎসবের আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

মালদা শহরে বর্ষামঙ্গল ও অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ২০ জুলাই সংস্কার ভারতী এবং সহকার ভারতীর যৌথ উদ্যোগে মালদা নগরের বিষ্ণু সেবক কক্ষে পালিত হলো বর্ষামঙ্গল ও অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা বিভাগ কার্যবাহ শ্যামল পাল, বিভাগ প্রচারক অধীন সিংহ, সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক কিশোর কুমার সরকার, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ জয়নারায়ণ রায়চৌধুরী, সহকার ভারতীর মালদা জেলা সম্পাদক সত্যজিৎ দাস, সংস্কার ভারতীর মালদা জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, সহ সভাপতি বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, জেলা লোককলা বিভাগ সংযোজক বাবলু মণ্ডল, সাহিত্য কলা বিভাগ সংযোজক ডঃ অঙ্কুর সেনশর্মা, জেলা সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী রুমা দে চৌধুরী, জেলা সদস্যা শ্রীমতী তন্দ্রা পাল, জেলা প্রচার প্রমুখ বিমল প্রামাণিক, বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিত্ব তাপস দাস প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সংস্কার ভারতীর ধ্যেয়গীত পরিবেশিত হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার। মূল ভাষণ রাখেন শ্যামল পাল ও অধীন সিংহ। তারপর সমবেত সঙ্গীত ও একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কিশোর কুমার সরকার। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশনের পর সকলের হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।ধ

‘শ্রদ্ধা’র ১৮৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ১৯ জুলাই তাদের ১৮৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে ৮১ বছর বয়স্ক, দাতা, যাত্রামোদী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর সিউড়ী শহর সংলগ্ন কড়িধ্যা পাঠশালার নিজ বাসভবনে। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সুপ্রাচীন ঔষধ ব্যবসায়ী তথা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীদাসের হাত-পা ধুয়ে-মুছে পূজা করেন তাঁর বৌমা প্রত্যুষা মুখোপাধ্যায়। মাল্যভূষিত করেন সংস্থার সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধা সংস্থার বিষয়ে আলোকপাত করেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীদাসকে আরতি করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। তাঁকে সহযোগিতা করেন সুজাতা বিষ্ণু। অর্ঘ্য হিসেবে শ্রীদাসকে বস্ত্র, উত্তরীয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত জেলারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা, সুকুমার ঘোষ, সমীর মণ্ডল, বিষ্ণুপদ রায় ও স্বপন ভট্টাচার্য। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন টিনা দাস ও আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীদাসের নাতনি শিবাঙ্গী এবং অত্রিজ মুখোপাধ্যায়, তাপস ও প্রণবেন্দু মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মণ্ডল। অনুভব ব্যক্ত করেন চন্দ্রিমা মৈত্র। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন চৈতালি মিশ্র। শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য। অতিথি আপ্যায়ন ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীদাসের পুত্র বামদেব মুখোপাধ্যায় এবং অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কুলতলিতে চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ১৫ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার (অধুনা সুন্দরবন জেলার) কুলতলি ব্লকের জামতলায় উদ্বোধন হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ‘মাটির ঋণ’ শোধ করার সংকল্প নেওয়া কয়েকজন ডাক্তারবাবুর অদম্য ও ঐশ্বরিক প্রচেষ্টায় তৈরি হওয়া— ‘জীবনরেখা নার্সিং হোম’। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী পূজনীয় পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের আশীর্বাদ ও পদ্মশ্রী ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডলের স্নেহের পরশ নিয়ে এবং শ্রীপাট খড়দহ দুর্গামন্দিরের শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীমৎ সঞ্জয় শাস্ত্রীজী মহারাজের উপস্থিতিতে এদিন এই পথ চলা শুরু। শারীরিক অসুবিধার কারণে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হতে পারলেও তিনি তাঁর আশীর্বাদ ও আন্তরিক শুভকামনা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই কুলতলির মানুষের জীবনরক্ষা ও আরোগ্যের এই ভবনে সশরীরে এসে সকলকে আশীর্বাদ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানীয় ডাক্তারবাবু ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। তাঁর পরম আশীর্বাদ নিয়ে জীবনরেখা নার্সিং হোমের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন আচার্য্য শ্রীমৎ সঞ্জয় শাস্ত্রীজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য, বরেণ্য শিক্ষক মনোজ কুমার মণ্ডল। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ভরত কুণ্ডু, পশ্চিম মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সঞ্জয় দাস, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সচিব ড. সুশান্ত মজুমদার ও কুলতলি থানার ইন্সপেক্টর-ইনচার্জ। বিশিষ্ট অতিথিদের পক্ষ থেকে এই মহতী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মনোজ কুমার মণ্ডলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিশিষ্ট অতিথিরা কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানান সেই শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবুদের যাঁরা তাঁদের চিকিৎসার স্নেহস্পর্শের মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষদের আরোগ্যের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এই ঐশ্বরিক কাজে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ত্যাগ ও সংকল্পের এক বিরল দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন এরাজ্যের বুকে। সেই ডাক্তারবাবুদের এবং এই সেবা প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় কর্ণধার ও উদ্যোগীবৃন্দকে বিশিষ্ট অতিথিরা এদিন অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি'র সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১১ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি'র পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিপ্লবীর পৌত্র শ্রী শান্তনু মুখোপাধ্যায় ও পৌত্রী শ্রীমতী নীহারিকা মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক বিটু রায়চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লেখক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত ও সৈকত নিয়োগী। এদিনের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গে 'পার্টিশন মিউজিয়াম' গড়ে তোলার জন্য বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সম্মেলনের আয়োজকরা সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, দেশভাগের ৭৯ বছর পরও অনেক প্রশ্ন আজও উত্তরহীন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। কিন্তু সেই 'স্বাধীনতা'র মূল্য ছিল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু হিন্দুর ঘরছাড়া জীবন, ব্যাপক রক্তপাত, অশ্রুবর্ষণ ও অনন্ত জীবন-যন্ত্রণা। ১৫ আগস্টের দিনেই শ্রীঅরবিন্দর জন্মদিন। তিনি লিখেছিলেন— 'India is free but she has not achieved unity, only a fissured and broken freedom...' 'The partition must go... It may be done by whatever means, but somehow it must happen.' অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্ন ছিল এক স্বাধীন, শক্তিশালী, অখণ্ড ও অবিভক্ত ভারত। দেশভাগের বাস্তবতা সেই স্বপ্নকে অসম্পূর্ণ রেখেছিল। দেশভাগ শুধু একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল না— এটি ছিল কোটি কোটি মানুষের জীবন থেকে শিকড় উপড়ে নেওয়ার ইতিহাস। উদ্বাস্তু শিবির, ট্রেনে ভেসে আসা মৃতদেহের স্তূপ, পরিত্যক্ত ভিটেমাটি, হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়, উদ্বাস্তু হিন্দুদের জীবন যন্ত্রণা, নতুন করে বেঁচে ওঠার সংগ্রাম— এসবই ভারতের জাতীয় স্মৃতির অংশ। তাই 'দেশভাগ যন্ত্রণা স্মরণ' শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়— এটি জেহাদিদের হিংস্র কার্যকলাপে হিন্দুদের উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়ার রক্তাক্ত ইতিহাস সংরক্ষণ, উদ্বাস্তু হিন্দুদের জীবন-সংগ্রামকে সম্মান জ্ঞাপন এবং আগামী প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরার এক আন্তরিক প্রয়াস। সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বলেন যে, দেশভাগের ইতিহাস ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আরও গুরুত্ব সহকারে পড়ানো উচিত। 'দেশভাগ যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা'র পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্য 'পার্টিশন মিউজিয়াম' গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়। □

TRUE LUXURY. NOW IN HOWRAH.

From the makers of The Ramdulari comes a landmark riverfront address.
For the first time, Howrah can experience truly exceptional living.

2.41 CR* ONWARDS | 3,4,5 BHK | FORESHORE ROAD

KNOW MORE

WBRERA/P/HOW/2025/003467 | rera.gov.in 98830 55000 primarcaadvika.com

PRIMARC AADVIKA

স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ

সনাতন ধর্ম চেতনা ও বৈদিক সাধকের জীবন কথা

মানসী দাস

স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, সংস্কৃত পণ্ডিত, ধর্মতাত্ত্বিক, বেদান্তের শিক্ষক এবং সনাতন ধর্মের রক্ষণশীল ধারার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম হরি নারায়ণ ওঝা। তিনি ১৯০৭ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি সংস্কৃত এবং বেদ উপনিষদ, মীমাংসা ও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে সংসারের প্রতি অনাগ্রহ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বর প্রাপ্তি। তিনি আদি শঙ্করাচার্য দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব কেবল বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি এবং ধর্মশাস্ত্রের নীতির আলোকে পরিচালিত জীবনযাপনের মাধ্যমে। একই সঙ্গে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতের কিছু দিক ছিল যেমন তিনি হিন্দু কোড বিলের বিরোধিতাও করেন। তিনি দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও সমাজচিন্তা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন— বেদার্থ পারিজাত, রামায়ণ-মীমাংসা, ভাগবত-তত্ত্ব, মার্কসবাদ অউর রামরাজ্য। করপাত্রী নামটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। 'কর' অর্থ হাত এবং 'পাত্র' অর্থ থালা বা বাটি। তিনি কখনো ভিক্ষাপাত্র ব্যবহার করতেন না; নিজের হাতকেই ভিক্ষাপাত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই কঠোর বৈরাগ্য এবং সরল জীবনযাপনের জন্যে তিনি করপাত্রী নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি ধর্মসভা, শাস্ত্রচর্চা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বৈদিক দর্শনের প্রচার করেন।

১৯৪০ সালে তিনি ধর্ম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

- সনাতন ধর্মের প্রচার।
- সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার।
- বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা।
- সমাজে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা।

এই সঙ্ঘের মাধ্যমে তিনি বহু আশ্রম, পাঠশালা এবং ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর স্বামী করপাত্রী মহারাজ উপলব্ধি করেন যে দেশের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব কমে যাচ্ছে। তাই ১৯৪৮ সালে তিনি 'অখিল ভারতীয় রামরাজ্য পরিষদ' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে আরআরপি ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় তিনটি আসন পায় এই দল। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে আরআরপি লোকসভায় দুটি আসন জয় করেছিল। ১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে হিন্দিভাষী রাজ্যে, মূলত রাজস্থান রাজ্যে, অখিল ভারতীয় রাম রাজ্য পরিষদ অনেকগুলি বিধানসভা আসন লাভ করেছিল। অন্যান্য হিন্দুত্ববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মতো 'আরআরপি'ও ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার পক্ষপাতী। পরবর্তীকালে আরআরপি ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলটির সঙ্গে মিশে অখিল ভারতীয় রামরাজ্য পরিষদ গঠিত হয়। আজও ২০টির বেশি জেলাতে স্বামী করপাত্রী মহারাজ দ্বারা সংকল্পিত রামরাজ্যে ধারণা, গোহত্যার উপর

একবার করপাত্রী মহারাজ ইন্দিরা গান্ধীকে অভিশাপ দেন— 'তুমি গোপাষ্টমীর দিন নিরীহ সাধুদের গুলি করে হত্যা করেছ এবং গোহত্যার অনুমতি দিয়েছ, যা এক মহাপাপ । তোমার গুলিবিদ্ধ হয়েই মৃত্যু হবে।'

নিষেধাজ্ঞা আর সনাতন ধর্মের রক্ষা এবং অখণ্ড ভারত হিন্দুরাষ্ট্র রক্ষা নীতি দ্বারা পরিচালিত। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে হিন্দুত্ব শব্দটি ১৯২৩ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রথম ব্যবহার করেন। এই দলের লক্ষ্য—

- শাস্ত্রসম্মত নৈতিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
- ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা।
- গোরক্ষা করা।
- গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন।
- ভারতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ।
- ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রশাসন।

দলটি যদিও জাতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তবুও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

স্বামী করপাত্রী মহারাজের নেতৃত্বে গোরক্ষা আন্দোলন

গোরক্ষা আন্দোলন হলো ভারতীয় গোবংশের সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবিতে গড়ে ওঠা একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন। হিন্দুধর্মে গোরুকে পবিত্র ও মাতৃসম মর্যাদা দেওয়া হয়। বেদ, পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে গোরুর গুরুত্বের উল্লেখ রয়েছে। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি কৃষিনির্ভর ভারতীয় সমাজে গোরুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। কৃষিকাজ, দুধ উৎপাদন, গোমূত্রের ব্যবহার এবং গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোরু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ শাসনকালে গোরক্ষা আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করে। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৮২ সালে পঞ্জাবে ভারতের প্রথম 'গোরক্ষিণী সভা' বা গোরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এই সংগঠন একটি বিশাল রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্জাবে শুরু হওয়া এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও বিস্তার লাভ করে। গোহত্যা বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও প্রচারপত্র বিলি হয়, যার ফলে পরবর্তীতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ ও দাঙ্গা শুরু হয়। এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল গোহত্যা বন্ধ করা, গোশালা প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের মধ্যে গোসংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও গোরক্ষা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। বহু ধর্মীয় নেতা, সন্ন্যাসী, হিন্দু সংগঠনের নেতা এবং সামাজিক সংগঠন দেশব্যাপী গোহত্যার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দাবি জানান। তাঁদের মধ্যে স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান সভার বৈঠকে হিন্দু নেতা পণ্ডিত ঠাকুর দাস, গোবিন্দ দাস, রঘুবীর সংবিধানে বিল পেশ করেন--- 'গোহত্যার উপর প্রতিবন্ধ লাগানো হোক। কিন্তু সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন 'ভারত একটি সেকুলার দেশ, ধর্মের উপর ভিত্তি করে এমন কোনো আইন বানানো যাবে না'। এরপর ১৯৫৫ সালে আবার চেষ্টা করা হয় বিল পেশ করার কিন্তু এবারও প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করেন, যদি গোহত্যার ওপর প্রতিবন্ধ লাগানো হয়, তবে আমি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করবো।' লোকসভায় ৯৬টি ভোট বিলের বিরোধিতা আর ১২টি ভোট সমর্থন করেছিল। এরপর ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর পর, ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন যদি ১৯৬৭ সালে লোকসভাতে কংগ্রেস জয়ী হয় তবে গোহত্যা নিষিদ্ধ করা হবে। হিন্দু সাধু ও সংগঠনগুলো ইন্দিরা গান্ধীর কথায় বিশ্বাস করে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রের ওয়াশিমে একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় সেখানে হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীরা এবং গো-রক্ষক লোকজন যখন গোরক্ষার দাবি জানিয়েছিলেন তার কিছুক্ষণের মধ্যে সেই শোভাযাত্রা বিশাল জনসংখ্যায় পরিণত হয়। সেই সময় পুলিশ লাঠি চার্জ করে কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়াতে পুলিশকে তাদের উপর গুলিচালানোর আদেশ দেওয়া হয়। সরকারি রিপোর্টে ১১ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যা রেকর্ডে জানানো হয়নি। মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা গোরক্ষা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে।

১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বর গোপাষ্টমীর দিন কাশীর স্বামী করপাত্রী মহারাজের নেতৃত্বে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, আর্য সমাজ, হিন্দু মহাসভা রামরাজ্য পরিষদের সঙ্গে সব সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসী, বৈদিক সমাজ, এমনকী দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিয়ে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মায়েরা এই আন্দোলনে যোগ দেন। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। করপাত্রী মহারাজের সঙ্গে আর্য সমাজের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও গোরক্ষা আন্দোলনের শোভাযাত্রা আর্য সমাজ থেকে শুরু করে রাজধানী দিল্লিতে জমা হয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পার্লামেন্ট ঘেরাও করা এবং গোরক্ষা বিল পাশ করানো। কিন্তু সংসদ ভবনের কাছে পৌঁছালে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ এবং পরে কাঁদানো গ্যাস ব্যবহার করে। এরপর পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ কোনো সতর্কবার্তা ছাড়াই গুলি চালাতে শুরু করে। এই ঘটনায় কত লোক মারা গেছে তার ঠিক কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, এমনকী যারা পুরোপুরি মারা যায়নি তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয় প্রমাণ নষ্ট করার জন্যে। এই হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুব্ধ করপাত্রী মহারাজ ইন্দিরা গান্ধীকে অভিশাপ দেন— 'তুমি গোপাষ্টমীর দিন নিরীহ সাধুদের গুলি করে হত্যা করেছ এবং গোহত্যার অনুমতি দিয়েছ, যা এক মহাপাপ । তোমার গুলিবিদ্ধ হয়েই মৃত্যু হবে।' 'করপাত্রীজী-সহ বহু সাধু সন্ন্যাসীকে তিহার জেলে রাখা হয়, প্রায় ৩ মাস তাদের সেখানে রাখা হয়। এমনকী সেই জেলের অন্য আসামিদের দ্বারা করপাত্রী মহারাজের উপর হামলা করানোও হয়। সেই পরিস্থিতিতে জেল থেকে মুক্ত করা হলে তিনি পুনরায় কাশী ফিরে আসেন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জয়লাভ করে। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস হিন্দু ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্যে গাই-বাছুর তাঁদের পার্টির প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে। সেই কংগ্রেস দল আজ দেশ থেকে মুছে যাওয়ার পথে। □

শিল্প ভাবনা

ডঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যার শিল্প-সংস্কৃতি-স্থাপত্যের বিশ্ব জুড়ে সুনাম। এই রুচিশীল শিল্পসম্ভারে পূর্ণ দেশ হওয়ার জন্য নানান জায়গা থেকে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করার লোভে লুঠেরারা আক্রমণ করেছে বারবার। নানা জাতি, নানান দেশ ভারতের বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি ধ্বংস করেছে, আর্থিক সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, সেই ইতিহাস সকলের জানা। ভারতবর্ষের শিল্প, সংস্কৃতি, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের মানচিত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য হলো— পশ্চিমবঙ্গ। এই পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নততম এক নাম। কোনো রাজ্যকে ছোটো না করেও বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ তার মন্দির, স্থাপত্য, চারুকলা ও কারুকার্যের সৃজনশীলতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অগ্রণী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মন্দির এবং মন্দির স্থাপত্যে সৌন্দর্যায়নের জন্য অলংকরণ বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। এই স্থাপত্য, ভাস্কর্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আরেকটি বিশেষ দিক রয়েছে, তা হলো— শিল্পকলা। একদম নির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হবে— চিত্রকলা। এই চিত্রকলায় এক অন্য মাত্রা যোগ করে—পটচিত্র। এই পটচিত্রের সৃষ্টি ধর্মীয় আবেগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে হলেও, পরবর্তী পর্যায়ে সামাজিক সৌন্দর্যায়নের জন্য পটের প্রতি আগ্রহ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মানুষের প্রায় নিত্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। নানান ধরনের পট, তা কখনো মাটির সরাতে, কখনো কাপড়ে, কখনো কাগজে তৈরি হয়েছিল, রং ছিল মূলত মাটিজ ও প্রাকৃতিক। পটচিত্র ধর্মপ্রাণ মানুষের পূজার্চনা উপস্থাপন ও বিশেষভাবে সংরক্ষণ করার কারণে তৃপ্ত ছিল সাধারণ মানুষ। শুরুতে দেবদেবীর অবয়ব অঙ্কনই বিষয় হিসেবে স্থান পেত, পরবর্তীকালে নানান সামাজিক বিষয় অবলম্বন করে অঙ্কিত হতো এই পট। আমরা এই শিল্পীদের 'পটুয়া' বলে জানি; আজও বহু পটুয়াপাড়া পশ্চিমবঙ্গের নানান আনাচে কানাচে রয়েছে। কালীঘাটের পট এক সময় বিরাট সুনাম অর্জন করেছিল এবং গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। পরবর্তীতে কালীঘাট ছাড়াও নানাস্থানে সমাজ-ভিত্তিক, জাতিভিত্তিক, ধর্মীয় আচার-সংস্কার আধারিত পট পরিলক্ষিত হয়। যেমন সাঁওতালদের এক ধরনের পট, অন্যান্য জাতি ও জনজাতির অন্যরকম। আজও মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় নিয়মিত এই পট চর্চা হয় এবং এই পটের জন্যই এই স্থানগুলি বিখ্যাত। তাঁদের জীবনধারণ রুটিরুজি এই পটকে নির্ভর করেই। আজও স্থানবিশেষে সামাজিক অবস্থান এবং তাদের পরম্পরার ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় এই ধরনের শিল্পকলা। সৃষ্টির শুরু থেকে এই দেশজ পরম্পরা দীর্ঘদিন ধরে একইভাবে চললেও পরবর্তী পর্যায়ে নানান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই চিত্রকলায়। কারণ সারা ভারতবর্ষে বহু ধরনের জাতির আগমন, আক্রমণ,তাদের বসবাস, তাদের রুচি, সংস্কৃতির এক ধরনের প্রভাব শিল্পকলার মধ্যেও পড়েছিল। অনেকে প্রভাবিত হয়েছেন, অনেকে প্রভাবিত হননি।

কোনো কোনো শিল্পী গ্রামবাঙ্গলার প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের জীবনধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ভর করে শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন। পরবর্তীতে শিল্পচর্চার শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয় নিয়মমাফিক। অখণ্ড ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি স্কুল ছিল এই শিল্প শিক্ষার, যেমন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল, বোম্বের স্যার জে.জে. আর্ট স্কুল, মাদ্রাজ আর্ট স্কুল এবং লাহোর আর্ট স্কুল। এগুলি আজ আর্ট কলেজ হলেও প্রথমদিকে আর্ট স্কুল নামেই শুরু হয়। এই স্কুল-কলেজ থেকেই বেরিয়েছেন নানান বিখ্যাত শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে চিত্রশিল্পী হিসেবে ঘরে ঘরে পরিচিতই শুধু নন, সারা বিশ্বব্যাপী আজ তাদের সুনাম। যাঁদের শিল্পকলাতে সমৃদ্ধ হয়েছে সমগ্র শিল্প সমাজ। এরকম প্রখ্যাত শিল্পীদের আমরা নানান প্রথাগত শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছি। যেমন যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য বিখ্যাত শিল্প-ব্যক্তিত্ব। পাশাপাশি বহু শিল্পী যাঁরা গুরুসম শিক্ষকদের নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানগত শিল্পশিক্ষা পাননি অথবা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে শিল্পচর্চা করে গিয়েছেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যাঁর তেমন প্রথাগত শিল্প শিক্ষা না থাকলেও বিশ্বের দরবারে আধুনিক শিল্পী হিসেবে তিনি সর্বকালের বিখ্যাত শিল্পস্রষ্টা, যাঁর সৃষ্টি আজও সর্বত্র সমান গুরুত্ব সহকারে আলোচিত। কাজেই এই শিল্পচর্চা একদিকে অসম্ভব ভালোবাসার তাগিদে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ও শিল্পীদের রুটিরুজিকে নির্ভর করেও গড়ে উঠেছিল। আজও বহু চিত্রশিল্পী নিজস্ব আবেগ, সমাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, সমাজের উত্থান পতন, মানুষের মানসিক নানান অবস্থাকে নির্ভর করে রং-তুলিকে সঙ্গী করে প্রকাশ করে চলেছেন অসংখ্য মৌলিক সৃষ্টি, যা বিশ্বের মননশীল মনকে অন্যভাবে ভাবতে সাহায্য করে থাকে।

শৈশব থেকে প্রায় সহজাত এই সত্তাটিকে নিয়ে শিশুরা জন্মায়। প্রকৃতিকে দেখে, মাকে দেখে, ভালোবাসার মানুষ, নানান কীটপতঙ্গ, ফুল, প্রজাপতিকে মনে ধরে অনুকরণের ইচ্ছে হয়, রং-রেখা দিয়ে তার রূপদান শুরু করে নিজের অজান্তেই রাঙিয়ে ফেলে— দেওয়াল, মাটি, খাতা, কাগজ ইত্যাদি জায়গা। এই শিল্পচর্চা পরবর্তীকালে কিছুটা সঠিক রূপ পায়— ভালোবাসায়, আগ্রহে। কেউ কেউ পারিবারিক সাহায্যে শিল্পশিক্ষার কলেজগুলিতে যায়, কেউ কেউ নিজের ইচ্ছাতে সৃষ্টি করে চলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পচর্চার জন্য বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেমন বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। রয়েছে নানান পুরনো ও নতুন আর্ট কলেজ, যেখানে নিয়মিত শিল্পচর্চার পঠনপাঠন হয়। সর্বোপরি সৃষ্টিশীল মনগুলো রং-রেখাতে আত্মভোলা হয়ে শিল্প সৃষ্টি করে চলে, যা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের দরবারে মানুষের মনে নিত্যনতুন অনুরণন সঞ্চারে সহায়ক হয়ে ওঠে। (ক্রমশ)

(লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

শুভাশীষ পাইন

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সত্যের কলমে নীলবিদ্রোহের অগ্নিসাক্ষী

দিনটি বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে ২৪ জুলাই এক গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবাহী দিন। আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক নির্ভীক সাংবাদিক, যাঁর কলম ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্রনিনাদ, যাঁর লেখনী শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিল। তিনি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, একটি সত্যনিষ্ঠ কলম কখনো কখনো হাজারো অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী হতে পারে। ১৮২৪ সালের ২৪ জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি অধ্যবসায়, মেধা ও ন্যায়বোধের পরিচয় দেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা ও ইংরেজি সাংবাদিকতার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের জনমত গঠনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। সেই সময় সংবাদপত্র কেবল সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্র ছিল না; বরং ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগরণের এক বলিষ্ঠ মঞ্চ। হরিশ্চন্দ্র সেই মঞ্চকে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন।

নীলকর সাহেবদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর সাহসী প্রতিবেদন বঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। বঙ্গের অসহায় কৃষকদের ওপর নীলচাষের নামে যে নির্মম নির্যাতন চলছিল, তার প্রকৃত চিত্র তিনি অকপটে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর ধারালো লেখনী ব্রিটিশ শাসনের অন্যায়কে প্রকাশ্যে এনে সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের দুর্দশা, কৃষকের কান্না এবং শোষণের নির্মম বাস্তবতা তাঁর প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে পরিচিত হয়। নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে জনমত গঠনে তাঁর অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেবল একজন সাংবাদিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু, সামাজিক ন্যায়বিচারের একনিষ্ঠ সৈনিক এবং সত্যের অবিচল সাধক। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতার ভয় তাঁকে কখনো সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর লেখায় যেমন যুক্তির দৃঢ়তা ছিল, তেমনি ছিল মানবিকতার গভীর স্পর্শ। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাংবাদিকতার প্রকৃত ধর্ম হলো সত্য উদ্ঘাটন করা এবং সমাজের নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

তাঁর নির্ভীক ভূমিকা পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রয়েছে। আজও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, নৈতিকতা এবং সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রসঙ্গ উঠলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, সংবাদপত্র কেবল তথ্যের বাহক নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনেরও শক্তিশালী মাধ্যম।

মাত্র ৩৬ বছর বয়সে, ১৮৬১ সালের ১৬ জুন তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণ তাঁর আদর্শকে থামাতে পারেনি। সত্যের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপোশহীন অবস্থান এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা তাঁকে বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর জন্মদিনে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সেই মহান সাংবাদিককে, যিনি কলমকে করেছিলেন প্রতিবাদের অস্ত্র, সংবাদপত্রকে করেছিলেন ন্যায়ের কণ্ঠস্বর এবং সত্যকে করেছিলেন জীবনের একমাত্র পথপ্রদর্শক। নতুন প্রজন্ম যদি তাঁর আদর্শ, সততা এবং সাহসকে ধারণ করতে পারে, তবে সমাজ আরও ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক এবং সচেতন হয়ে উঠবে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক প্রণাম। তাঁর অমর আদর্শ যুগে যুগে সত্যসন্ধানী মানুষকে অনুপ্রাণিত করুক, ন্যায়ের পথে চলার সাহস জোগাক এবং সাংবাদিকতার মর্যাদাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুক। □

গ্লোবাল ডিপস্টেট ও ককরোচ জনতা পার্টি ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের ব্লু-প্রিন্ট ফাঁস

ড. রামানুজ গোস্বামী

সাম্প্রতিককালে যে বিষয়টি নিয়ে সারা ভারতেই একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তা হলো রাজধানী দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন, সংসদ অভিযান ইত্যাদি। এই হিংসাত্মক ঘৃণ্য, অসভ্য এবং বর্বরোচিত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটাই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের ছাত্র-যুবরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে পড়েছে। আসলে ককরোচ জনতা পার্টি বা সিজেপি-র এই আন্দোলন মোটেও ছাত্র-যুব সমাজের দ্বারা পরিচালিত কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আন্দোলন নয়। এর গভীরে নিহিত আছে এক গভীর ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্র। এর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকা-স্থিত গ্লোবাল ডিপস্টেট-এর হাতে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এরা এই ভাবেই অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে সরকার বদল করে গ্লোবাল ডিপস্টেটের উদ্দেশ্য পূরণ করবে। এইরকম অপদার্থ ও পুতুল সরকার বসানোর নোংরা ষড়যন্ত্র করে থাকে। বাইরে থেকে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সব রকম ভাবে এরা সহায়তাও করে থাকে। তার জন্য পাওয়া যায় মোটা অর্থের জোগানও। বহু দেশের ক্ষেত্রেই এরা এই প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। এবার এদের লক্ষ্য হলো ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা সুদৃঢ় মোদী সরকারকে যেকোনো প্রকারে ক্ষমতা থেকে ফেলে দেওয়া। উল্লেখ্য যে, এই কাজে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দোসর হয়েছে কংগ্রেস, আপ, তৃণমূল কংগ্রেস (মমতা ব্যানার্জির অবশিষ্ট গুটিকয়েক অনুচর), বিভিন্ন বামপন্থী দল-সহ বিজেপি বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান অভিজিৎ দিপকে আসলে এই গ্লোবাল ডি স্টেটেরই একজন এজেন্ট এবং তাকে আমেরিকা থেকে ভারতে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের ব্লু-প্রিন্ট দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই স্বনামধন্য ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি একদা আম আদমি পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল এবং ওই দলের নির্বাচনী প্রচারের কাজেও সে সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিল। কয়েক বছর আগেই দিল্লিতে শাহিনবাগ আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং দিল্লির ভয়াবহ দাঙ্গার ছবি দেখেছে গোটা দেশ। ঠিক চেনা ছকেই এগোচ্ছে এই ককরোচ জেহাদিরা। প্রথমদিকে এইসব বিক্ষোভ আপাতদৃষ্টিতে শান্ত এবং অরাজনৈতিকই থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এদের আসল উদ্দেশ্যগুলো প্রকাশ্যে আসে। এখানেও তেমনটাই হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে যে, এরা মোটেও ছাত্র-যুব সমাজের প্রতিনিধি নয়। এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন যারা করেছে তাদের বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছে এবং মূলত বামপন্থীরাই এই লোক জড়ো করার কাজটা করছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই তথাকথিত বিক্ষোভে দেখা গিয়েছে সেকু-মাকু-ফেকু, অ্যান্টি-ইন্ডিয়া, অ্যান্টি-হিন্দু, টুকরে-টুকরে গ্যাঙের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদেরও। এবার এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক কেন এটি একটি ভারত-বিরোধী বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়— (১) শোনা গিয়েছিল যে, নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে এই আন্দোলন করা হচ্ছে। কিন্তু সংসদ অভিযানের সময়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাংবাদিকরা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকজন, সাধারণ মানুষ কেউই এই ককরোচ জঙ্গিদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। গাড়ি ভাঙচুর, হাইড্রোজেন দ্বারা চালিত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, পুলিশকে মারধর ইত্যাদি সবকিছুই করেছে এই অসভ্যের দল। এদের বর্বরতা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লির ১৬টি মেট্রো স্টেশনকে বন্ধ রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এরই পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতাবাদী আজাদি স্লোগান উঠেছিল, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা পুনর্বহালের দাবি উঠেছে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে, সংসদ ভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে, প্রশ্ন ফাঁসকে সামনে রেখে আসলে এই দাঙ্গাবাজরা একটা ভয়ংকর পরিকল্পনা নিয়েই এই আন্দোলনে নেমেছিল।

(২) আন্দোলনের আরেক পাণ্ডা সোনম ওয়াংচুক যে আদ্যন্তই গ্লোবাল ডিপস্টেটের এজেন্ট এবং চূড়ান্তভাবেই চীন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানপ্রেমী— এ ব্যাপারে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বরাবরই তার ভারত-বিরোধী মন্তব্যের জন্য যথেষ্ট কুখ্যাত।

(৩) আসলে ভারত-বিরোধী শক্তি এটা বুঝেছে যে, গণতান্ত্রিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বিজেপিকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই বিদেশি শক্তির মদতে একজোট হচ্ছে বিজেপি-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বলাই বাহুল্য যে, এই দলগুলির প্রত্যেকটি হলো আগাগোড়া ভারতবিরোধী এবং এদের কাজই হলো ভারতকে টুকরো টুকরো করে ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা। স্বাভাবিকভাবেই তাই এরা এই জঙ্গিদের সমর্থন করছে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতবাসীকে তাই আজ একজোট হতেই হবে। দীর্ঘ ১২ বছরেরও অধিক সময় ধরে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর নেতৃত্বে যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলেছে, তারই ফলস্বরূপ ভারত আজ চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ রূপে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দিশাহীন রাজনীতির চক্রব্যূহ থেকে ভারত আজ মুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে। তাই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি (তা সে বিদেশিই হোক না ভারতের অভ্যন্তরেই হোক) কোনোভাবেই যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেটা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। যন্তরমন্তরে বসে আপামর ভারতবাসীর মগজ ধোলাইয়ের ছক করেছে জঙ্গি দাঙ্গাবাজরা। যেকোনো প্রকারে একে রুখতেই হবে। ভারতের স্বার্থে আজ সমস্ত দেশভক্ত ভারতীয়কে এগিয়ে আসতেই হবে। সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই এই দাগাবাজরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক)

ফঃ ৫

চিন্ময় প্রভুর পর বাংলাদেশে আরেক হিন্দু নেতা জেলবন্দি

কানু রঞ্জন দেবনাথ

বর্তমান বাংলাদেশে যারাই হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করতে চেষ্টা করছে, কিংবা আত্মরক্ষার্থে বা ধর্মীয় অধিকার রক্ষার্থে বা নিজেদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার দাবি আদায়ের জন্য হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে, তাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে একটাই, সেটা হলো বাংলাদেশের জেল। এটাই বোধ হয় সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অঘোষিত নীতি। তা সে হোক না কেন নোবেল বিজয়ী (নামে বামপন্থী তথা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী কট্টর হিন্দুবিরোধী) মহম্মদ ইউনুসের রাজত্বকাল, কিংবা হোক বা কেন বর্তমানে 'ধর্ম যার যার, বাংলাদেশ সবার' ঘোষণাকারী (খালেদা জিয়াপুত্র) অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজত্বকাল। আসলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিয়ে কিছুটা উদার হলেও কট্টর হিন্দুবিরোধীদের চাপের কাছে বা আন্দোলনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং তাদের কথামতো শেষ সিদ্ধান্ত নেন বলেই ধীরে ধীরে সেটাই মনে হচ্ছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর থেকে বাংলাদেশে এই অবস্থা চলে আসছে। শেখ হাসিনার আমলে হিন্দুরা মাঝে মাঝে অত্যাচারিত হলেও বর্তমানে এই পরিস্থিতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভু প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর বাংলাদেশে ঘটমান নিরপরাধ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, লাঞ্ছনা এবং হিন্দু হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সরব হয়েছিলেন। একতাহীন, ভীতু, দুর্বল, বাংলাদেশের হিন্দুদের বিভিন্ন ভাষণ বা বক্তৃতার মাধ্যমে সাহস জুগিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এমনকী চট্টগ্রামে এবং অন্য জায়গায় এক লক্ষের ওপর হিন্দু নিয়ে বিশাল বিশাল প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কেউ বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দুদের এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করার এমন সাহস দেখাতে পারেননি। তাই সে সময়ের ইউনুস সরকার চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর বিরুদ্ধে ভুয়া ও সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে প্রথমে গ্রেপ্তার এবং পরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। আজ প্রায় দেড় বছরের ওপর চিন্ময় প্রভু জেলে আটক রয়েছেন। বাংলাদেশ কোর্ট তাকে জামিন দিতে চাইলেও বাংলাদেশ সরকার এর তীব্র বিরোধিতা করে জামিন আটকে দিচ্ছে।

গত ১২ জুলাই বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হন হরিদাস চন্দ্র তরুণী দাস। তিনি হলেন বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার ৮১ ফুট উঁচু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের (বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো) মূর্তি নির্মাণের প্রধান উদ্যোক্তা। আসলে বাংলাদেশের যেখানে এই শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তিটি তৈরি হচ্ছিল, সেই জায়গাটা হচ্ছে হিন্দুদের একটি মন্দির পরিসর। সেখানে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পে ভগবান রামের ৮১ ফুট, ভগবান কৃষ্ণের ৫০ ফুট এবং ভগবান শিবের ৩০ ফুট উচ্চতার মূর্তি নির্মাণের কথা। এর উদ্দেশ্য ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের তিন প্রধান দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং স্থানটিকে হিন্দুদের একটি অন্যতম তীর্থস্থানে বা দর্শনীয় স্থানে পরিণত করে হিন্দু ঐক্য এবং সংহতি জাগিয়ে তোলা।

কিন্তু বাংলাদেশের কট্টর হিন্দুবিরোধীদের দাবি হলো বাংলাদেশের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এতবড়ো শ্রীরামের মূর্তি তৈরি করা যাবে না। কারণ তাদের মতে, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখলে তাদের পাপ হয়। তাদের মজহবে নাকি হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি দেখা নিষিদ্ধ। এত উঁচু মূর্তি বানালে দূর থেকেই তাদের চোখে পড়বে। ফলে তাদের পাপ হবে। তাই তারা এই মূর্তি বানাতে দেবে না। যেটুকু বানিয়েছে সেটুকুই নাকি তারা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। এইজন্য তারা বিভিন্ন জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল। শ্রীরামমূর্তি-বিরোধী এই আন্দোলন প্রথম ইন্ধন জুগিয়েছে বা বাংলাদেশের কট্টর মুসলমানদের খেপিয়ে তুলেছে পিনাকী ভট্টাচার্য নামে এক ধর্মান্তরিত জেহাদি। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কট্টর হিন্দুবিরোধীদের চাপে প্রথমে শ্রীরামমূর্তি নির্মাণ বন্ধ রাখে এবং পরে এই মূর্তি তৈরির প্রধান মালিককে মিথ্যা ও সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়।

ত্রিপুরা রাজ্যের বেশিরভাগ বাঙ্গালি হিন্দু পূর্বপুরুষের বাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশে। যদিও বর্তমান বাংলাদেশ আগে ভারতেরই একটি অংশ ছিল। অথচ তাদের বংশধরদের অনেককেই দেখা যায় লাদাখের ব্যক্তি সোনম ওয়াংচুকের অনশনের জন্য চোখের জল ফেলতে বা তাদের হৃদয় বিগলিত হতে। কিন্তু পাশের বাংলাদেশে চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর জন্য কিংবা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসের জন্য এতটুকু চিন্তা বা কষ্ট তাদের হয় না। তাদের প্রাণ একবারও বাংলাদেশের নিরপরাধ হিন্দু নেতাদের জন্য কাঁদে না। সোনম ওয়াংচুকের জন্য প্রাণ কাঁদার আগে চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর জন্য বা হরিদাস চন্দ্র তরণী দাসের জন্য প্রায় কাঁদার দরকার ছিল। বিদ্যালয়ে ছোটোবেলায় 'দ্য বিশপ'স্ ক্যান্ডলস্টিক্স' নামে একটি ইংরেজি গল্পে পড়েছিলাম, 'চ্যারিটি বিগিইনস্ অ্যাট হোম', অর্থাৎ দয়া বা ভালোবাসা প্রথম নিজের মানুষের জন্য শুরু হয়। যাদের নিজের বা কাছের মানুষের জন্য হৃদয় কাঁদে না, তাদের পরের বা দূরের মানুষের জন্য কান্নাটা কেমন জানি বোধগম্য হয় না। এটা যেন নিজের মায়ের অসুস্থতার জন্য না কেঁদে পরের মায়ের অসুস্থতার জন্য কাঁদা! □

ব্যক্তির থেকে দল এবং দলের থেকে দেশ বড়ো

সভ্য সমাজ-জীবন যাপনে দেশ ও রাজ্যের সরকার বা প্রশাসনের ভূমিকা অপরিহার্য— সুতরাং সবার ওপরে দেশ বড়ো।

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

'ব্যক্তির থেকে দল এবং দলের থেকে দেশ বড়ো'— রাজ্য বিজেপি সভাপতি উবাচ। ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির অসাধারণ বিজয়ের পরে দলের

গণতন্ত্রে ব্যক্তির (অর্থাৎ মানুষের) অবস্থানই মূল্যবান। তাঁর অধিকার, কর্তব্য, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। সেখানে কারুর দলদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যদিও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেরকমই হোক, দেশের প্রতি আনুগত্য তথা ত্যাগ স্বীকার করার অঙ্গীকার হলো এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি।

বিশুদ্ধতা রক্ষার মানসে রাজ্য সভাপতি শ্রী শমীক ভট্টাচার্য মহাশয় ঘোষণা করেন ৪ মে বেলা ১২টার পরে তৃণমূল কংগ্রেস বা অন্য দল থেকে যারা বিজেপিতে ঢুকে পড়েছেন স্থানীয় নেতাদের সহায়তায় বা এখনো যারা বর্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিজেপি তাদের দলীয় সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না, এমনকি দলীয় নেতৃত্ব যেন তাদের সঙ্গে কোনো সংশ্রব না রাখে— অর্থাৎ তিনি বোঝালেন যে, বিজেপির তৃণমূলীকরণ আটকাতে হবে যেকোনো উপায়ে।

একথা স্বীকার্য যে, কোনো দলে তৃণমূলীদের অনুপ্রবেশ দূষণ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। রাজ্যবাসী বিগত দেড় দেশককে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে, সর্বভারতীয় (অথচ আঞ্চলিক) তৃণমূল দলটি শুধু রাজনৈতিক দূষণই নয়— তাদের সংস্পর্শ এড়াতে না পারলে বাঙ্গালিকে তার হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ভুলে অবাঙ্গালি-অভারতীয় এক কিম্ভুতকিমাকার জাতিতে পর্যবসিত হতে হবে। সুদখোর জাতীয় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন তাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নাকি, নিজের বাপকেও সুদ আদায় থেকে অব্যাহতি দেন না— তেমনই তৃণমূল জাতীয় প্রজাতির মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তোলাবাজ নন এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি যে ছুঁৎমার্গের প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, তা দলের সতীত্ব রক্ষায় অব্যর্থ না হলেও, তৃণমূলীয় দুর্বৃত্তায়ন থেকে বিজেপি দলকে কিছুকালের জন্য মুক্ত রাখতে পারবে এই হলো আশা।

তবে, ইতিমধ্যেই খারাপ তৃণমূল-ভালো তৃণমূল নিয়ে বিজেপির অন্দরে যে প্রশ্ন উঠেছে তাও কিন্তু শমীকবাবুকে মোকাবিলা করতে হবে দুর্বল অবস্থান থেকে। কেননা ৪ মে-র পরেও তৃণমূলের রাঘব বোয়ালদের কেউ কেউ (সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিক বরাইক) ইতিমধ্যেই শমীকবাবুর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ভবিষ্যতে জাতীয় স্বার্থে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে এই প্রতিবেদকের ধারণা। কোয়েল মল্লিকের রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগের পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাই তার ইঙ্গিতবাহী। বিজেপি দলের অন্দরে একটি মহল মনে করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস দলের সরকার গত দেড় যুগ ধরে এরাজ্যে যে দুর্নীতিরাজ বা প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কায়েম করেছিল, তার ফসল তৃণমূলের প্রায় সবাই ভোগ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক নেতানেত্রী হয়তো সরাসরি দুর্নীতির সাথে যুক্ত না থাকলেও তাঁরা চোখের সামনে পশ্চিমবঙ্গের অধোগমনে চুপ ছিলেন ক্ষমতা ভোগের লালসায়। এই দ্বিতীয় গোছের ব্যক্তিদের 'ভালো তৃণমূল' ধরে নিয়ে বিজেপির দলীয় স্বার্থে তাদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের চেষ্টা হলেও, অনেকেই তা পছন্দ করছেন না। এ বিষয়টা রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যে বোঝেন না তা নয়। তাই তাঁকে 'দলের থেকে দেশ বড়ো' কথাটি বলতে হচ্ছে। যদিও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনায় এ বক্তব্যটি চিরন্তন এবং সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রহিতে, জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে, বিরোধীদের দলীয় স্বার্থের রাজনৈতিক বাধা অতিক্রমে যদি নবাগত রাজ্যসভার সদস্যদের সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তা স্বাগত।

সদ্য বিধ্বস্ত, প্রায় বিলুপ্ত মমতা ব্যানার্জিপন্থী তৃণমূলের এই দশা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে শিক্ষণীয় বার্তা নিয়ে যাচ্ছে যে, দলের আগে ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলে তার পরিণতি হতে পারে ভয়ানক। তাই বলে ব্যক্তিতান্ত্রিক দলগুলি কি শেষ হয়ে

যাচ্ছে, না রাজনীতি থেকে 'পরিবারতন্ত্র' বিলুপ্ত হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়াও, বিশ্বে ভূরিভূরি উদাহরণ আছে যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতি সাফল্য পেয়েছে' তা সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থা হোক; এমনকী তথাকথিত সাম্যবাদী ব্যবস্থাতেও। মমতা ব্যানার্জি নিজেও ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনীতিতে কেবল হাত পাকিয়েছেন তা নয়— দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। গণতান্ত্রিক ভারতের কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এমন স্পর্ধিত হুঙ্কার কি শোনা গিয়েছে যে, 'বিধানসভার সব আসনে আমি প্রার্থী'? দলের উপরে ব্যক্তির এই সাফল্য যুগে যুগে সর্বত্র ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটির সৃষ্টি রহস্যেই রয়েছে এক ব্যক্তির দলকে চ্যালেঞ্জের ইতিহাস। আজকের দলছুট তৃণমূলীরা যে সমস্ত অজুহাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে ছেড়ে নব্য তৃণমূল, এনসিপিআই বা অন্য দলে যাচ্ছেন সেই সমস্ত তৃণমূলী সাংসদ-বিধায়ক বা অন্য জনপ্রতিনিধিরা বুকে হাত দিয়ে বলুন তো মমতা ব্যানার্জির হাত মাথায় না থাকলে তাঁদের নিজস্ব ক্যারিশমা দিয়ে নির্বাচিত হতে পারতেন? অপরপক্ষে, এই বছর এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যদি নির্বাচনী সাফল্য পেত, তাহলে এই সকল নেতা-নেত্রীরা আজ যা বলছেন, তা কি তখন বলতে পারতেন? অভিষেক ব্যানার্জির কর্তৃত্বের বাহানায় যারা দলছুট তারা দলে কখনো অভিষেক ব্যানার্জির প্রথাবিরুদ্ধ উত্থানের বিরোধিতা করেছেন? বরং অভিষেক-ভজনা এবং তার সান্নিধ্য পেতে তাঁরা এতদিন সদাব্যস্ত ছিলেন না-কি? তবে দল ত্যাগের এই বাহানা কেন? আপনারা কি জানতেন না তৃণমূলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট? যারা ভাবছেন তৃণমূলের ধরাশায়ী হওয়ার কারণ অভিষেক ব্যানার্জি বা আইপ্যাক, তারা শুধু সুবিধাভোগের জন্য বাহানা খুঁজছেন। কেননা তারা জনরোষ থেকে বাঁচতে এবং নিজেদেরকে তৃণমূলী দুষ্কর্মের থেকে আলাদা করতে এসমস্ত বলছেন স্বজ্ঞানে। মমতা ব্যানার্জির একনায়কত্বে পরপর তিনবার রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূলের নির্বাচনী সাফল্য এসেছে যদিও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটা নিরপেক্ষ হয়েছে তা নিয়ে অনেকের মনে সংশয় আছে। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন যদি সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ না হত, তাহলে আগের মতই এবারও পিসি-ভাইপোর কপালেই জয়টীকা পড়ত। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পূর্বের নির্বাচনগুলি সমীক্ষা করে তাদের অভিজ্ঞতায় যাতে নির্বাচন অবাধ এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক হয় তার জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ আধা সেনা মোতায়েন করা ছাড়াও, ভোটের বহু আগে থেকেই স্পর্শকাতর এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছে তোলামূলি দুষ্কৃতী ও জেহাদিদের জব্দ করার জন্য। এবারে শুধু ভোট কেন্দ্র নয় তার বাইরেও নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছে। ভোট লুঠ ঠেকাতে মাস্তানদের হয় গ্রেপ্তার, নয় সতর্ক করা হয়েছে এবং নির্বাচনে কারচুপি ঠেকাতে প্রত্যেকটি বুথে সিসি ক্যামেরা এবং ভোটিং মেশিনে ভিভিপ্যাটের সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিকভাবে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করেছে। তদুপরি এসআইআর-এর মাধ্যমে ভুয়ো, অবৈধ ভোটার এবং একই ব্যক্তির একাধিক বার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পরিচ্ছন্ন ভোটের ব্যবস্থা করায় ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ রেকর্ড সংখ্যক ভোটার ভোট দিয়ে তাঁদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। দুই দফা মিলিয়ে এরাজ্যে এবার গড় ভোট পড়েছে ৯৩-৯৪ শতাংশ। এই নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির অসংখ্য কারণ রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ হলো— চরমতম প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, শাসক দল তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের দম্ভ আস্ফালন-সহ রাজ্য জুড়ে জেহাদি, হত্যাকারী, ধর্ষকদের দাপাদাপি বন্ধে শাসকের নিষ্ক্রিয়তা এবং সর্বোপরি তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের জনবিচ্ছিন্নতা তথা হিন্দু-মানসে নিরাপত্তাহীনতা।

তৃণমূল দলটির অন্তর্জলি যাত্রার আরেকটি কারণ হচ্ছে— গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে ভারতের সাংবিধানিক স্তম্ভগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা। সংবিধানে উল্লেখিত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কথা বলেও, প্রশাসন পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনৈতিক জেহাদ ঘোষণা তথা রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুযোগ না নিয়ে বাঙ্গালি বঞ্চনার সুর বাঁধা, যা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। বরং তৃণমূলের কেন্দ্র-বিরোধিতা রাষ্ট্রবিরোধিতার রূপ নিয়েছে যা প্রকট হয়েছে— নিজস্ব রাজ্য সঙ্গীত চালু, অশোক স্তম্ভের পরিবর্তে বিশ্ববঙ্গ লোগো তৈরি তথা বিদেশি জাতীয় ধ্বনি 'জয় বাংলা'র প্রচলন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে নিজস্ব ভোটব্যাংকের একাংশ তৃণমূল দলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে ভোটে তৃণমূলকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় দুর্নীতিপরায়ণ জনপ্রতিনিধি, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইপ্যাকের ওপর— যারা ইতিমধ্যেই 'আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে'; জনগণের উন্নয়নের কোটি কোটি টাকা লুঠ করে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, ক্যাফে, ক্লাব, বিনোদন পার্ক/আউট হাউস ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের পাপে নিজেরা ডুবেছে। এর দায়-ভাগ ওই দলের সকলের। তাই শুধুমাত্র অভিষেক ব্যানার্জিকে দায়ী করলে সত্যের অপলাপ হবে। তবে একথা ঠিক দলনেত্রীর প্রশ্রয় না থাকলে এতবড়ো দুর্নীতির সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারত না; ভোটে পরাজয় ঘটলেও দলের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকতো। 'সততার প্রতীক' বহু বছর আগেই তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রে ব্যক্তির (অর্থাৎ মানুষের) অবস্থানই মূল্যবান। তাঁর অধিকার, কর্তব্য, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। সেখানে কারুর দলদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যদিও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেরকমই হোক, দেশের প্রতি আনুগত্য তথা ত্যাগ স্বীকার করার অঙ্গীকার হলো এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভিত্তি। সভ্য সমাজ-জীবন যাপনে দেশ ও রাজ্যের সরকার বা প্রশাসনের ভূমিকা অপরিহার্য— সুতরাং সবার ওপরে দেশ বড়ো।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

১৯৭১ : বাঙালি হিন্দুর রক্তে কেনা বাংলাদেশ ইন্দিরা গান্ধীর কৃতিত্ব, নাকি প্রতারণা ?

দীপল বিশ্বাস

১৯৭১-এর আগস্টে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সীমান্ত রক্ষায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বীরগতিপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক চুড়কা মুর্মুর সাহসী আত্মবলিদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে গিয়ে মনে প্রশ্ন জাগছে যে, সেই মুক্তি সংগ্রামে তাঁর মতো অসংখ্য বাঙ্গালি হিন্দুর আত্মবলিদান সত্যিই কতটা সফল হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১-এর ২৪ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার যুদ্ধ শুরু পর্যন্ত সময়টা 'মুক্তিযুদ্ধ' পরিস্থিতি ছিল না, সেটা ছিল— 'এথনিক ক্লিনজিং'। পাকিস্তানি জুন্টা (পাক সামরিক বাহিনী) আর তার পূর্ব পাকিস্তানের দোসর রাজাকার-আলবদরদের ঘোষিত এজেন্ডা ছিল পাইকারি হারে 'হিন্দু নিধন'। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ২০১৩ সালের রায়ই তার প্রমাণ। 'মিরপুরের কসাই' আবদুল কাদের মোল্লার বিচারের পর ট্রাইব্যুনাল প্রকাশিত রায়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, সে কীভাবে মিরপুরে হিন্দু পরিবারগুলিকে ধরে এনে ব্রাশফায়ার করেছে। দেলওয়ার হোসেন সাইদির ক্ষেত্রে দেওয়া রায়ে রয়েছে কীভাবে সে পিরোজপুরে হিন্দু পল্লী জ্বালিয়ে দিয়েছে, মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, হিন্দু নারীদের তুলে নিয়ে গেছে। এই ট্রাইব্যুনালের এরকম আরও রায় আছে। সেইসব নথি চীৎকার করে যেন বলছে ১৯৭১ ছিল পরিকল্পিত 'হিন্দু জেনোসাইড'।

পূর্ব পাকিসস্তানে এই গণহত্যায় ৩০ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করা হয়। ২ লক্ষ হিন্দু নারীকে পাকিস্তানি ক্যান্টনমেন্টে ধর্ষণ করে 'যুদ্ধের ট্রফি' বানানো হয়েছে। ১ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে, যার ৮০ শতাংশ হিন্দু। তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছিল শেষ ভরসা নিয়ে— প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার তাদের বাঁচাবে।

আর কংগ্রেস কী করল? তারা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ৯ মাস ধরে চলা পাক সামরিক বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটে ৩০ লক্ষ হিন্দু হত্যা হতে দিল, হিন্দুর রক্ত নিয়ে এদেশে রাজনীতি করল; ভারতের ৩,৮৪৩ জওয়ানের মৃতদেহ আর কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে পাকিস্তানকে সামরিকভাবে যদিও-বা পরাস্ত করল এবং 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হলো, কিন্তু পুরোপুরি রাজনৈতিক বিজয় হাসিল না করেই শুরু হলো তাদের আসল প্রতারণা।

১৯৭২-এর সিমলা চুক্তি। কংগ্রেস সরকার ৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধী পাকসেনাকে বিনা শর্তে ছেড়ে দিল। বিনিময়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য একটা শব্দও খরচ করল না। বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কোনো সংখ্যালঘু সুরক্ষা চুক্তি নেই, কোনো আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি নেই। কেন? কারণ কংগ্রেসের রাজনীতিতে হিন্দুর জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাদের কাছে 'সেকুলারিজম' মানে হিন্দুর আত্মবলিদানকে অস্বীকার করা।

সবচেয়ে ঘৃণ্য কংগ্রেসি বিশ্বাসঘাতকতা হলো ১ কোটি হিন্দু শরণার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশের ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে মৈত্রী চুক্তির ভরসায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন এই মৈত্রী চুক্তির গ্যারান্টার এবং ইন্দিরা গান্ধীর 'ছোটো ভাই'। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুরা সুরক্ষিত হল না যুদ্ধের পরও। তাঁদের দখল হয়ে যাওয়া জায়গা-জমি, সম্পত্তি তাঁরা ফেরত পেল না; ১৯৭২ থেকে '৭৫— প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু আবার উদ্বাস্তু হলো। এদিকে কংগ্রেসিদের চোখে শেখ মুজিব তখন 'বঙ্গবন্ধু'। এরপর ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট যখন বাংলাদেশি সেনার বুলেটে ওই বঙ্গবন্ধু মুজিবের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করা হলো, তখন দিল্লি কী করল? কাপুরুষের মতো মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাংলাদেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়'-এর দোহাই দিয়ে তারা হাত গুটিয়ে নিল। তিন দিনের মধ্যে মুজিব হত্যাকারী মোস্তাক সরকারকে 'ডি-ফ্যাক্টো' স্বীকৃতি দিয়ে দিল। যে লোকটার (মুজিবের) নামে হিন্দুরা মুক্তিযুদ্ধ লড়ল, পূর্ব পাকিস্তানের দেড় কোটি হিন্দুর মধ্যে ৩০ লক্ষ হিন্দু প্রাণ দিল, যাকে ভরসা করে ইন্দিরা গান্ধী মাঝপথে হিন্দুদের ছেড়ে দিল— হিন্দুদের প্রাণরক্ষার সেই গ্যারান্টারকে রক্ষা করতে পারল না ভারতে ক্ষমতাসীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। তো তারা সাধারণ হিন্দুকে আর কী রক্ষা করবে?

৫৪ বছর পর ফলাফল আজ সামনে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় প্রমাণ করেছে যে, ১৯৭১-এ হিন্দুদের টার্গেট করা হয়েছিল। অথচ সেই স্বাধীন বাংলাদেশেই ১৯৭১-এ হিন্দু ছিল ২০ শতাংশ, আর আজ ৮ শতাংশ। অর্ধেকের বেশি হিন্দু সেদেশে গত ৫৫ বছরে উধাও। 'ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট' দিয়ে চলছে হিন্দুর জমি লুট। মন্দির ভাঙা। হিন্দু মেয়ে অপহরণ। যুদ্ধে হিন্দু ছিল 'মুক্তিযোদ্ধা'। কমান্ডার সি.আর. দত্ত, ডাঃ নারায়ণ সাহা-রা রক্ত দিলেন। আর স্বাধীনতার পর সেই হিন্দুই হয়ে গেল 'সংখ্যালঘু', নিজ ভূমি হতে উদ্বাস্তু।

তাই শেষ কথা একটাই। বাংলাদেশি হিন্দুদের প্রাপ্তি আজ মাইনাসে হওয়ার জন্য দায়ী কে? রক্ত দিলো হিন্দু, ভারতে তার ক্রেডিট নিলো কংগ্রেস, আর আজও মূল্য চোকাতে হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুদের। পাকিস্তান-ভাগ ভারতের নিরাপত্তা বাড়াল, কিন্তু আত্মবলিদানকারী হিন্দুদের রক্তঋণ শোধ হলো না। ৩০ লক্ষ আত্মবলিদানকারী হিন্দুর অভিশাপ কংগ্রেসকে তাড়া করে বেড়াবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৬০ লক্ষ ইহুদির প্রাণ বলিদানের কারণে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি ইহুদিদের সুরক্ষায় 'ইজরায়েল' সৃষ্টি করে, তাহলে ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের দখল নেওয়ার পরও কেন সেদেশের হিন্দু ও বৌদ্ধদের সুরক্ষা নিশ্চিত না করেই সেনা ফিরিয়ে নেওয়া হলো? ইতিহাস কখনো ক্ষমা করবে না ইন্দিরা গান্ধীর এই ধোঁকা যার ফল দীপুচন্দ্র দাসের মতো অসংখ্য হিন্দু-বৌদ্ধ নরনারীকে আজও ভোগ করতে হচ্ছে। ২০২৬ সাল পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুকে আবার সাহসী করেছে, নতুনভাবে ভাবতে শেখাচ্ছে। ভারতের ইতিহাসের এহেন অন্যায়কে শ্রীরামজন্মভূমি উদ্ধারের ঘটনার মতো আগামীদিনে মুছে ফেলে বাঙ্গালি নিজের অধিকার পুনরুদ্ধারের রাস্তা খুঁজে পাবে এই আশা করি। □

কিশোর গল্প

বাঘ মামার কথা

দেবদাস কুণ্ডু

বাঘ মামা কিন্তু বাঘের মতো শক্তসামর্থ্য পুরুষ ছিলেন না। রোগা পাতলা ছেটোখাটো চেহারার মানুষ ছিলেন। কাজ করতেন ভিলাই ইস্পাত কারখানায়।

বাঘমামা মাঝে মাঝে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমরা ভাই-বোনেরা তখন ছোটো। মামা একদিন একটা বাঘের গল্প বললেন। সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছিলেন। এক ঘণ্টা বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছেন। শেষে বাঘ সামনের থাবাদুটি তুলে বলেছিল— 'তুমি আমার চেয়ে শক্তিশালী। এমন মানুষ আমি দেখিনি। নমস্কার, আমি চললাম।'

সবাই অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ভাবটা, এই রোগা মামা বাঘের সঙ্গে লড়েছে? ছোটোভাই আমার কানে কানে বলল— দাদা, মামা কিন্তু মিথ্যে কথা বলছেন।

রোগাপাতলা চেহারা নিয়ে মামা বাঘের সঙ্গে এক ঘণ্টা লড়াই করলেন, আমার কাছেও ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য লেগেছিল। মামা বললেন,

—তোরা অবাক হচ্ছিস তো?

—কিন্তু বাঘ কথা বলছে... আমি বললাম।

—মানতে পারছিস না তো? তাহলে আমার সঙ্গে সুন্দরবন চল। আমি দেখিয়ে দেবো বাঘ শুধু গর্জন করে না, বিপদে পড়লে কথাও বলে। শুনে মা বলে উঠল, না না মেজদা, ওরা সুন্দরবন টুন্দরবন যাবে না।

মামা একবার এসে বলেছিলেন, একটা মস্তানকে শায়েস্তা করেছেন। আর একবার বলেছিলেন, একটা চোরকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এমন নানা সাহসিকতার গল্প বাঘমামা বলতেন। আমরা বুঝতে পারতাম সব মিথ্যে, সব ঢপ। বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে বলে আড়ালে মেজোমামাকে বাঘমামা বলতাম। মা রেগে যেত, তার মেজদা যে!

* * *

আমি এখন বড়ো হয়েছি। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করি। সেদিন ফিরতে একটু রাত হয়েছে। কাজের চাপ ছিল। শর্টকাট অন্ধকার খালপাড় ধরে হেঁটে আসছি। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একটা লোক দাঁড়াল আমার সামনে। শক্ত সামর্থ্য চেহারা। মোটা গোঁফ। লাল চোখ। ঝাঁকড়া চুল। কবজিতে লোহার বালা। বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, যা আছে দিয়ে দে। না হলে এই ছুরিটা পেটে সেঁধিয়ে দেবো।

তখন আমার মনে পড়ল বাঘমামার কথা। আমার ভেতর এক সাহস জেগে উঠল। শক্ত হাতের মুঠি দিয়ে আমি একটা ঘুসি মারলাম। ও মা! অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

তখন আমার মনে হলো বাঘমামা কোনোদিন মিথ্যে বলেননি। উনি আসলে আমাদের সাহসী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় উদ্যান

গ্যালথিয়া

ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রেট নিকোবর দ্বীপে অবস্থিত একটি সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান। এটি ১১০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অব বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই উদ্যান বিশাল চামড়াওয়ালা কচ্ছপ (জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল)-এর জন্য বিখ্যাত। যা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ডিম পাড়ার স্থান। এছাড়াও এখানে লবনাক্ত জলের কুমির নিকোবর মেগাপেড, বিরল কাঁকড়াভোজী বাঁদর, নিকোবরি পায়রা দেখা যায়। এখানে ঘন ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বন, ম্যানগ্রোভ এবং লবনাক্ত জলের বনভূমি রয়েছে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে জাহাজে করে ক্যাম্পবেল উপসাগরে পৌঁছাতে ৪ থেকে ৫ দিন সময় লাগে। সেখান থেকে নৌকা বা স্থানীয় পরিবহণের মাধ্যমে এই উদ্যানে যাওয়া যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২২

সম্বোধনম্-পুংলিঙ্গে (ভাগ:-১)

বালক: গচ্ছতি। বালকটি যায়।

বালক:! গচ্ছতু। ওহে বালক! যাও।

ছাত্র:! পঠতু। ওহে! ছাত্র পড়ো।

শিক্ষক:! বদতু। শিক্ষক মহাশয়! বলুন।

রাম:! খাদতু। ওহে রাম! খাও।

সঞ্জয়:! লিখতু। ওহে সঞ্জয়! লিখ।

মোহন:! উপবিশতু। ওহে মোহন! বসো।

সুভাষ:! ক্রীড়তু। ওহে সুভাষ! খেলো।

অসীম:! আগচ্ছতু। ওহে অসীম! এসো।

(এভাবে বাক্য রচনা করতে হবে)

ভালো কথা

বৃষ্টির দিনে

এবার রথযাত্রার দিন সকাল থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। এই আনন্দের দিনে এত বৃষ্টি, তাই মনটা ভালো লাগছিল না। বিকেলের দিকে একটু বৃষ্টি কমেছিল। তখন আমি জানালার ধারে বসেছিলাম। দেখলাম, ছোটোরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে ছোটো ছোটো রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। ভাবছিলাম, আমিও তো একটি ছেটো রথ নিয়ে এভাবে টানতে পারতাম। একটু পরেই মা-বাবার সঙ্গে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির আগে গন্ধেশ্বরী মন্দিরের সামনে বড়ো রথ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে আমিও রথের দড়িতে হাত লাগালাম। একটু পরেই আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। রাস্তায় বাবা পাঁপড়ভাজা কিনে দিলেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমি মনে মনে একটি কবিতা তৈরি করলাম । সেটি আগামী নবাঙ্কুরের পাতায় দেবো।

দেবমাল্য সাউ, ষষ্ঠশ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

রথের মেলা

প্রীতম দাস, অষ্টমশ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

রথের মেলা বড়োই মজা
এবার যে খুবই বৃষ্টি,
ঠাম্মা শুনে রেগে বলল,
বর্ষার সময় পড়বে কি মিষ্টি!
বৃষ্টির জন্য রথের মেলায়
পাঁপড়ভাজার নেইকো বালাই,
জিলিপি সব ঠাণ্ডা বেজায়
স্বাদ মেটাই তাই গুড়ের খাজায়।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

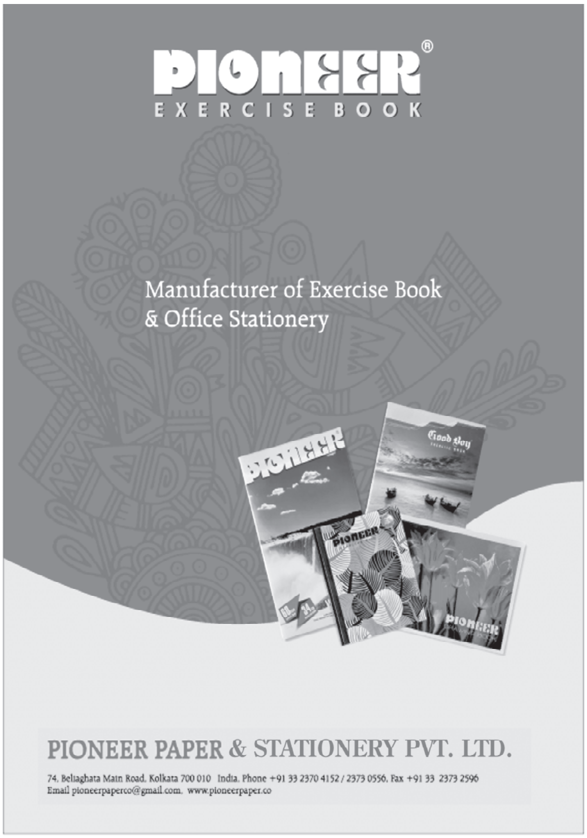

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

রবীন্দ্রসঙ্গমে শ্যামাপ্রসাদ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পরম্পরা

পরম্পরা এরই নাম। বৃত্তের দু'টি বিন্দু এভাবেই মেলে পরস্পরে। পিতাতে যার শুরু, পূর্ণতা তার পুত্রে। জীবনের এটাই নিয়ম। এই নিয়মেই প্রবহমান সভ্যতা এক সত্য থেকে পৌঁছয় আরেক সত্যে। রবীন্দ্র সাগরসঙ্গমে এভাবেই মিশেছে আশুতোষ তনয় শ্যামাপ্রসাদের জীবননদী।

বয়সে আশুতোষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন বছরের ছোটো। প্রাথমিকভাবে দুজনের জীবনচর্যায় ছিল আশ্চর্য সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যও। আশুতোষ ছিলেন একইসঙ্গে সুবিজ্ঞ আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ। প্রিয় বিষয় তাঁর গণিত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্যের নানা কুসুমে নিত্য অঞ্জলি দান তাঁর প্রতিদিনের প্রয়াস। ঔপনিষদীয় দর্শনে আপ্লুত তাঁর চিত্ত জাতীয়তা তথা মানবতার পথে সদা প্রবহমান। প্রথাগত শিক্ষার পথে না গিয়েও তিনি চিরশিক্ষার্থী। জ্ঞানার্জন তাঁর উপাসনা।

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের জীবনই একদিক থেকে আবর্তিত কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এবং দু'জনেই শিক্ষার প্রসারে নিবেদিত প্রাণ। আর সে কারণেই কর্মজগতে ভিন্ন পথচারী হলেও দেশের শিক্ষা সম্পর্কে সদা চিন্তাশীল। প্রকৃত শিক্ষা প্রসারে তাঁরা দু'জনে এসেছিলেন পরস্পরের কাছাকাছি। সম্পর্ক আন্তরিক, বিনম্র শ্রদ্ধাভারে অবনত। আপাত-দূরত্বর কারণ পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধ আবার সেই বোধজাত সমীহই দু'জনকে অন্তরের বন্ধনে করেছে নিকটতর।

ঠিক কবে, কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ও আশুতোষ পরিচিত হয়েছিলেন অথবা কাছাকাছি এসেছিলেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতো কেউ কেউ মনে করতেন, 'আশুতোষের পরিধিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশ ঘটনা তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ সরকারিভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'ডি-লিট' উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিল সেকথা হয়তো ঠিক।'

অবশ্য একা সুকুমার সেন নন, সুবোধ সেনগুপ্ত এবং আরও কেউ কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের কৃতিত্বকে খাটো করার একটা প্রবণতা দেখান। এমনকী 'রবীন্দ্রজীবনী'র গ্রন্থকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হইবার পর কবিকে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা হয়, এ অভিযোগ ঐতিহাসিক সত্য নহে' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫১-৪৫২) বলে স্পষ্টভাষায় সবকিছু জানানোর পরও অধ্যাপক সেনগুপ্ত তা মানতে চাননি। কিন্তু এ ব্যাপারে ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহের 'ডি-লিট না নোবেল' নিবন্ধ প্রকাশের পর সুবোধ সেনগুপ্ত আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। সুকুমার সেনও এই সম্পর্কিত তথ্যটি মেনে নিয়েও তাঁর 'আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে একটু তির্যক সুরে বলেছেন, 'তবে একথাও বে-ঠিক নয় যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি যশ (এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কানাঘুষা) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জ লর্ড হার্ডিঞ্জের এবং রেক্টর লর্ড কারমাইকেলের অবগতিতে আগেই এসেছিল (অথবা সেক্রেটারি অব স্টেটস তাঁদের আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন)।'

যে কোনো বিষয়কে বক্রদৃষ্টিতে দেখার ব্যাপারে মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবজাত এইসব বিবৃতি প্রতিবিবৃতির অরণ্যে না ঘুরে আশুতোষ-রবীন্দ্রনাথ পরিচয় প্রসঙ্গে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তার ওপর নজর রাখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে ১৯১৩-তে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-লিট' দেওয়ার বহু আগে থেকেই ছিল দু'জনের পরিচয় এবং তা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠও বটে।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) দীনেশচন্দ্র সেনকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আশু মুখুজ্জে মশায়কে প্রাচীন বাংলা গদ্যপ্রকাশ সম্বন্ধে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখে পাঠান। পূর্ব-পরিচয় না থাকলে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ কখনোই এমন কথা লিখবেন না।

রবীন্দ্রনাথের আরও বেশ কিছু চিঠিপত্র থেকে অনুমান করাই যায়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার সময় অথবা তার কিছু আগে থেকেই উভয়ে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। এবং সে পরিচয় নেহাত সাধারণ ভদ্রতা বা সৌজন্যমূলক নয় বলেই আন্দাজ করা যায়।

রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি আশুতোষের মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পর থেকেই। কিছুটা প্রথা ভেঙেই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পরের বছরের বিএ পরীক্ষার বাংলার প্রথমপত্র করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ সে দায়িত্ব নিতে রাজি হননি।

ফ ঃ ৬

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই রবীন্দ্রনাথের মনে কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা দানা বাঁধে, সেই ভাবনা থেকেই তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে বুঝতে পারেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা কোনো কথার কথা নয়। তার জন্য টাকা দরকার প্রচুর। এই প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারকে ১৩১৮ সালের ৭ বৈশাখ এক চিঠিতে লেখেন, 'কলেজ স্থাপনের পরামর্শ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ...ক্লাসের ঘর ও সরঞ্জামের টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কি না সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।' (ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড)। পৃ. ৩১৫-৩১৬)।

কেবল কলেজ নয়, শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও কবি প্রায়শই আলোচনা করতেন আশুতোষের সঙ্গে আর আশুতোষও সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে কেবল ডি.লিট নয়, দিয়েছেন তাঁর মা জগত্তারিণী দেবীর নামাঙ্কিত স্বর্ণ পদকটিও প্রথম বছরেই। দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার নানা প্রস্তাব। কবি-জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি নিয়োগ করেন কৃষি বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে। আরও অনেক কিছু করার ভাবনা ছিল আশুতোষের মনে। কিন্তু ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর হঠাৎ প্রয়াণে ছেদ পড়ে তাতে। তবে সেটা সাময়িক। বাবার অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণের দায়িত্বটা শ্যামাপ্রসাদ স্বেচ্ছায় তুলে নেন মাথায়।

সূত্রপাত

কবির সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের পরিচয় আশুতোষের জীবনকালেই। শ্যামাপ্রসাদ তখনও ছাত্র। ১৯২১-এর আগস্টে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লিখে তাঁর নোবেল প্রাপ্তির সঠিক দিনটি জানতে চান। সে চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'স্নেহাস্পদেষু, ঠিক তারিখ মনে নেই এইটুকু মনে আছে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি নোবেল প্রাইজের খবর আমার কাছে আসে। —শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ আগস্ট ১৯২১।'

১৯২১ খ্রিস্টাব্দেই আশুতোষের অনুমোদন ও প্রেরণায় দাদা রমাপ্রসাদের সঙ্গে সাহিত্য মাসিক 'বঙ্গবাণী' প্রকাশ করেন শ্যামাপ্রসাদ। সেই পত্রিকার জন্য প্রায়ই তিনি যেতেন কবির কাছে। এবং সেই সূত্রেই অথবা তার আগে থেকেই স্নেহডোরে বাঁধা পড়েন শ্যামাপ্রসাদ। সেই বন্ধন আরও দৃঢ় হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদের বিবাহকে কেন্দ্র করে।

শ্যামাপ্রসাদের বিয়ে হয়েছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী সুধা দেবীর সঙ্গে। বিহারীলাল ছিলেন বাংলা রোমান্টিক গীতি কবিতার প্রথম স্রষ্টা ও সার্থক পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর ভক্ত, অনুগামী। বিহারীলাল ছিলেন তাঁর আদর্শও। তিনি ছিলেন তাঁর ভাবলোকের গুরুস্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'ভোরের পাখি' হিসেবে। বলেছেন, 'আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।'

কবি বিহারীলালের বড়ো ছেলে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বড়ো মেয়ে বেলা বা মাধুরীলতার। মাধুরীলতার দেওরের মেয়ে সুধার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের বিয়ে হওয়ায় তিনি সেই সম্পর্কে হলেন রবীন্দ্রনাথের নাত-জামাই। এই মিষ্টি মধুর সম্পর্কের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন কবির আরও স্নেহভাজন। আরও নিকট জন।

অবশ্য এই বিয়ের আগে থেকেই শ্যামাপ্রসাদের উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবনের সাফল্যের কথা জানতেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সূত্রে শ্যামাপ্রসাদের সাহিত্য প্রীতির সঙ্গেও পরিচয় ছিল তাঁর। আশুতোষের মতোই শিক্ষার প্রতি শ্যামাপ্রসাদের প্রবল আগ্রহও মুগ্ধ করেছিল কবিকে। এই মুগ্ধতা ও স্নেহের কারণেই প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন শ্যামাপ্রসাদের প্রতি— একথা বলাই চলে।

সম্পর্কের রসায়ন

আশুতোষ-রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্কের রসায়নটা এক অর্থে বিচিত্র এবং অবশ্যই মধুর রসে সিক্ত। আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমবয়সি। মূলত শিক্ষানুরাগ ও জাতীয়তাবোধ তাঁদের ঘনিষ্ঠ করেছিল। তবে সে সম্পর্কের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট সম্ভ্রমপূর্ণ। ফলে তাঁদের মধ্যে ছিল কিছুটা দূরত্বও।

অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ হলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধুপুত্র। বয়সে তাঁর ছোটোছেলে শমীন্দ্রনাথের (জন্ম ১৮৯৬ খ্রিঃ) চেয়েও পাঁচ বছরের ছোটো। ফলে সম্পর্কটা ছিল স্নেহরসে সিক্ত। শ্যামাপ্রসাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনেক অকপট। অন্যদিকে, শ্যামাপ্রসাদও অনায়াসে বলতে পারতেন অনেক কথা। করতে পারতেন আবদারও। সেই কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে আশুতোষের অনুরোধ সবসময় সাড়া দিতে না পারলেও শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাবে মত দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে।

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সহজ-সরল স্নেহের সম্পর্ক হওয়ার কারণেই আশুতোষকে যে কথা বলতে পারেননি, শ্যামাপ্রসাদকে সে অনুরোধ করেছেন প্রায় অনায়াসে। অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদও তাঁর ক্ষমতার সীমাটা জানতেন বেশ ভালোভাবেই। সে কারণেই কবি কোনো কিছু বললেই যে সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করে দিতেন অথবা করে দিতে পারতেন তা নয়। এই না-করার পেছনে অবশ্য কোনো ঔদ্ধত্য থাকত না। আর তাই সেই অনুরোধ না রাখার কারণে দু'জনের সম্পর্কে কখনোই কোনো তিক্ততা আসেনি।

রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালোভাবেই জানতেন, ক্ষমতার বাইরে হওয়ার কারণেই শ্যামাপ্রসাদ সে অনুরোধ রাখতে পারেননি। এও জানতেন, সরাসরি অনুরোধ রক্ষা করতে না পারলেও ঘুরপথে তার একটা সমাধান করার চেষ্টা করবেনই শ্যামাপ্রসাদ।

একটি ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর ছোটোজামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে কৃষি বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেছিলেন আশুতোষ। অধ্যাপক হয়ে নগেন্দ্রনাথ থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বাড়িও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি

বিদেশবাসের পর ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ওই বাসভবনটি আর দেয়নি। জামাইয়ের কথায় কিছুটা নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি জানান শ্যামাপ্রসাদকে। চিঠি লিখে এর একটা সুরাহা করার অনুরোধ জানান কবি ১৯২৬-এর ১০ জানুয়ারি।

আশুতোষ তখন প্রয়াত। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বিরোধীদের হাতে। শ্যামাপ্রসাদ সেসময় একজন সিন্ডিকেট সদস্য মাত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট উষ্মা ও অনুযোগভরা চিঠি পেয়েও কিছু করাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। চেষ্টা করেও রবীন্দ্রজামাতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বাসভবনটি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেননি শ্যামাপ্রসাদ। তবে হাল না ছেড়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলাপ-আলোচনা করে নগেন্দ্রনাথের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনের বদলে বাড়িভাড়া ভাতা মঞ্জুর করান।

কোনো অনুরোধ করলে শ্যামাপ্রসাদ যে তা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, একথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন কবি। তাই অন্যের অনুরোধ উপরোধে তাদের জন্য উমেদারি করে শ্যামাপ্রসাদকে প্রায়ই চিঠি দিতেন রবীন্দ্রনাথ। এটা যে ঠিক নয়, পারতেন না বলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চিঠি দিতেন। সেই সঙ্গে ভুগতেন এক ধরনের আত্মগ্লানিতে। তাই প্রায় জীবন সায়াহ্নে এসে কবি এক চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদকে লেখেন—

'কল্যাণীয়েষু,

মাঝেমাঝে নিতান্ত দায়ে পড়ে তোমাকে উপরোধ পত্র দিতে হয়, তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করবে না। যদি বিশেষ কারণে কর্তব্যরোধে তোমাকে কারও জন্য বা কিছুর জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে তবে সে চিঠি কোনো আবেদনকারীর হাত দিয়ে পাঠাব না— সে আমি নিজেই তোমার হাতে পৌঁছিয়ে দেব। ...ইতি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩ মে, ১৯৩৪।'

শ্যামাপ্রসাদ বিএ পাশ করার পর থেকেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বহু কাজের ব্যাপারে নির্ভর করতেন তাঁর উপর। নিতেন পরামর্শও। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের একটা ধারণা গড়ে ওঠে পড়াশোনা শেষ করার বহু আগে থেকেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদের ওপর আশুতোষের নির্ভরতার কথা জানতেন কবিও। তাই অনেক সময় আশুতোষ নয়, শ্যামাপ্রসাদকেই কথাটা জানাতেন। যেমন, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদকে লিখলেন,— 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু লেখবার সময় পাইনি— শীঘ্র যে পাব এমন আশা করিনে। অথচ যখন প্রতিশ্রুতি দ্বারা বদ্ধ আছি তখন ফাঁকি দেওয়া চলবে না। অতএব যদি না লিখে মুখে মুখে কিছু বললে নিয়মবিরুদ্ধ না হয় তাহলে চীন যাবার আগে একটা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি। মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমাকে ছাড়তে হবে। আমাকে আগামী ২৩ তারিখে ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের একটি সভায় সভাপতির কাজ করতে যেতে হবে। সেই সময় যদি দেখা করতে পার তাহলে সব কথা আলোচনা হতে পারবে। চীনে যাবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে একবার কোনো সুযোগে দেখা করে যেতে চাই— কী উপায়ে হতে পারবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে।'

অবশ্য এই একবার নয়, রবীন্দ্রনাথ এর পরেও শ্যামাপ্রসাদের সাহায্যপ্রার্থী হন। ১৯২৫-এ কবি যখন বিদেশে, সেই সময়ই প্রয়াত হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রসুহৃদ আশুতোষ চৌধুরী। তারই মধ্যে আরও একটি দুঃসংবাদ পান রবীন্দ্রনাথ। সরকারি স্বীকৃতি না পাওয়ায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেত। সেটা সম্ভব হয়েছিল আশুতোষের চেষ্টায়। কিন্তু প্রায় হঠাৎই সেই সুযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেই সমস্যা সমাধানে তৎপর হলেন। কথা বললেন শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে। তিনি তখন সিন্ডিকেটের একজন সদস্যমাত্র। তবুও সকলের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরিয়ে আনেন আগের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল। সেই শান্তিনিকেতন শিক্ষা ভবনের 'মধ্য' ও 'উপাধি' প্রাপকরা ইচ্ছে করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএ এবং বিএ পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ই ধ্যানজ্ঞান

১৯৩০ থেকেই শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়অন্ত প্রাণ। তখন থেকেই শান্তিনিকেতন তথা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ হলেন আরও ঘনিষ্ঠ। পাঠ্যতালিকায় আরও বেশি স্থান পেতে থাকে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যেন হয়ে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদের অঘোষিত অভিভাবক।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে হাসান সুরাবর্দি হলেন বাগীশ্বরী অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথকেও 'বিশেষ অধ্যাপক' পদে নিয়োগে মুখ্য ভূমিকা নিলেন শ্যামাপ্রসাদই। এই নিয়োগ নিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধীরা সরব হলে বিব্রত কবি চিঠি দেন শ্যামাপ্রসাদকে। জবাবে ১৯৩২-এর ২৪ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ লিখলেন,— 'দু'চারজন সঙ্কীর্ণমনা কি বলছে না বলছে সে দিকে আমাদের নজর দিলে চলবে না। আমার পক্ষে একথা বলা ধৃষ্টতা যে, আমাদের কোনো কোনো ভালো কাজে নামতে গেলেই প্রথমত অল্পবিস্তর বাধাবিপত্তি হতেই হবে, কিছু অসঙ্গত আলোচনাও

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

হবে। কিন্তু সে আলোচনা, বাধাবিপত্তি বেশিদিন স্থায়ী হয় না, যতই আমার কাজের দিকে অগ্রসর হই, বাধাবিপত্তি আপনা হতেই সরে যায়। যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ভিক্ষা করেছি, সে কাজ যথার্থ দেশের মঙ্গলকারক। ...আপনি দ্বিধাশূন্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।'

১৯৩৪-এ মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে উপাচার্য হন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু তার বহু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে যুক্ত করার উদ্যোগ নেন তিনি। ১৯৩২-এর ৬ আগস্ট সেনেট হলে কবির সত্তর বছর পূর্তির যে অনুষ্ঠান হয় তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

ওই বছরই তাঁর বড়দিদির নামাঙ্কিত 'কমলা বক্তৃতা' দেওয়ার জন্য মনোনীত হন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৩-এর ১৬, ১৮ ও ২০ জানুয়ারি 'মানুষের ধর্ম' নামে সে বক্তৃতা দেন কবি। এছাড়া ওই বছরের ডিসেম্বর এবং ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারিতে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' এবং 'শিক্ষার বিকিরণ' শীর্ষক আরও দু'টি বক্তৃতা দেন কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৩৩-এ সামান্য রোগভোগের পর মৃত্যু হয় শ্যামাপ্রসাদের স্ত্রী সুধাদেবীর। শোকাহত শ্যামাপ্রসাদকে সান্ত্বনা দিয়ে কবি লেখেন, '...জীবনের সর্বপ্রধান অভিজ্ঞতা মৃত্যুতে, সেই মৃত্যু যখন নিকটতম আত্মীয়ের ঘটে, তখন অন্তরের গভীরতম কথা উদ্ঘাটিত হয় তার আঘাতে। সেইখান থেকে তুমি বৈরাগ্যের বাণীকে লাভ করো যা ইহলোক ও পরলোকের মাঝখানে দৌত্যসাধন করে এই প্রার্থনা করি।'

শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৪-এর ৮ আগস্ট থেকে ১৯৩৮-এর ৮ আগস্ট পর্যন্ত চার বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এই ৪ বছরে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে যুক্ত করেন তিনি। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গীত রচনা এবং বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে নজির গড়েন রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৮ বছরের জীবনে প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৫-এর ২৪ জানুয়ারি। পরের বছরের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের জন্য শ্যামাপ্রসাদ নেন আরও কয়েকটি ব্যবস্থা। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তৈরি হয় নিজস্ব পতাকা। ব্রিটিশ রাজশক্তির পরিবর্তে পতাকায় স্থান পায় 'শ্রী' ও 'পদ্ম'। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গীত রচনা করার। রবীন্দ্রনাথ লেখেন দু'টি গান— ১. শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান এবং ২. চলো যাই, চলো যাই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় গানটিকে বেছে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত হিসেবে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাপ্রসাদ নিলেন আরও একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সেবছর ১৭ ফেব্রুয়ারি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ দেন দীক্ষান্ত ভাষণ। পূর্বের সব প্রথা ভেঙে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সে ভাষণ দিলেন। শ্যামাপ্রসাদের সম্মতিতেই সম্ভব হয় সেটা।

উপাচার্য হয়েই শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় প্রবেশিকা পরীক্ষা (ম্যাট্রিক) বাংলাভাষায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৩ জনের এক কমিটি গঠন করেন।

একইভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ে বাংলা পরিভাষা ও বানান বিধি সংস্কারে এক কমিটি গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ। তার মাথায় থাকেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়'।

পিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথই যেন হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পরম আশ্রয়। সবসময় দেখা হতো না, কিন্তু চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগটা থাকতই। রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত শেষ চিঠিটি লেখেন তিনি ১৯৪০-এর ১৪ ডিসেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য মুসলিম লিগ 'মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আনে।' তারই প্রতিবাদে ডিসেম্বরের ২১, ২২, ২৩ তারিখে প্রতিবাদ সভা ডাকা হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে। রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনের উদ্বোধন করুন এটাই ছিল শ্যামাপ্রসাদের ইচ্ছে। কিন্তু কবি তখন অসুস্থ। তাই তাঁর কাছে বাণী চেয়ে শ্যামাপ্রসাদ লেখেন চিঠিটি।

শ্যামাপ্রসাদ লেখেন,— '...বাংলাভাষা ও ইতিহাসের উপর যে অন্যায় আক্রমণের পর্ব আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই পূর্ণসমাপ্তি এই বিলের দ্বারা সাধন করিবার অপচেষ্টা হইতেছে। আজ এই সময় আপনার বজ্র-বাণীর দ্বারা সারা বাংলার হিন্দুকে পুনর্জাগ্রত করুন যেন তাহারা সকল বাধা ও বিপদকে তুচ্ছ করিয়া আপন শিক্ষামন্দিরের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়।'

শেষ দেখা

১৯৪১-এর সাত আগস্ট। অপরাহ্ন বেলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামাপ্রসাদ মালা হাতে। পিতৃসম অভিভাবককে হারিয়ে তিনি তখন নিথর— নীরব।

এক সময় অস্তমিত রবি-কবির মরদেহ নিয়ে এগিয়ে আসে শোকমিছিল। এগিয়ে যান শ্যামাপ্রসাদ। প্রণাম করে দেন মালা। তারপর মিছিলের সঙ্গী। নিমতলা মহাশ্মশানে শেষ ক্রিয়া। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখায় বিলীন কবির কাঞ্চনপ্রভ শরীর।

শ্যামাপ্রসাদ দেখছেন— বিশ্বমানবতার পূজারি'— 'বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ সন্তান'— 'ভারত সংস্কৃতির প্রতীক'— তাঁর প্রাণপ্রতিমের দেহ পঞ্চভূতে বিলীনের মুহূর্তে দৃষ্টি তাঁর পশ্চিমাকাশে অস্তগামী রবির রক্তরাঙা আলোর দিকে। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে— শুধু জল।

গুরুদক্ষিণা

১৯৫১। অর্থ সংকটে ধুকছে বিশ্বভারতী। সংকট মোচনে তৎপর শ্যামাপ্রসাদ। বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে। বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় আওতায় আনতে পেশ হলো বিশ্বভারতী বিল (১৯৫১)। সব বিরোধী যুক্তি খণ্ডন করে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখলেন শ্যামাপ্রসাদ। সংশোধন করলেন বিলটির ত্রুটি। বাদপড়া বিদ্যালয়ও অন্তর্ভুক্ত হলো বিলে। বিল পরিণত হলো আইনে। সেইসঙ্গে আত্মবলিদানের বছর তিনেক আগে দান সাঙ্গ হলো শ্যামাপ্রসাদের গুরুদক্ষিণা পর্ব।

(রবীন্দ্রপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার

এক জীবন, এক আদর্শ, এক অনুপ্রেরণা

অরবিন্দ দত্ত

রাতের আকাশের দিকে তাকালে অজস্র তারার ভিড়ে যে ধ্রুবতারাটি সবসময় আপন আলোয় জ্বলজ্বল করে স্থির থাকে, আমার জীবনে তিনি ছিলেন ঠিক সেই ধ্রুবতারা— ডাঃ দিলীপ কুমার সরকার। আজ যে অরবিন্দ দত্ত তাঁর স্মৃতিচারণ করে দু'কলম লিখছে, এই অরবিন্দ দত্তের সম্পূর্ণ পরিচয়টি কেবল তাঁরই দান। তিনি যদি সেদিন না থাকতেন, তবে হয়তো এই পৃথিবীতে আমার কোনো অস্তিত্বই থাকত না। মুনি-ঋষিরা বলেন, ঈশ্বর আমাদের মাঝেই বিরাজ করেন। আমি সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিলাম আমার 'মামা'র পরিচয়ের আড়ালে থাকা এক মনীষীর মাঝে। আমাদের মাঝে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যে আত্মিক টান তৈরি হয়েছিল, তা রক্তের সম্পর্ককেও হার মানায়।

সময়টা ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি। শিলচর মেডিক্যাল কলেজে আমার মায়ের জীবনাবসান ঘটে। আমার বয়স তখন মেরেকেটে সাত কী আট বছর। বাবাকে হারিয়েছি তারও দু-তিন বছর আগে। মায়ের মৃত্যুতে এই বিশাল শহরে আমি সম্পূর্ণ অনাথ ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার মায়ের ক্যানসার হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসার সমস্ত খরচ এবং অপারেশনের দায়িত্ব সেদিন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের তৎকালীন প্রধান, আমাদের ডাক্তারবাবু। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় মা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও, ডাক্তারবাবু আগেই জানিয়েছিলেন যে এই মারণরোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া কঠিন। বিধিলিপি মেনে সত্যিই একদিন মা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মায়ের মৃত্যুর সেই মুহূর্তটি আজও আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। মা যে চিরকালের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, সেই ছোট্ট বয়সে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু দেখছিলাম, মা আর কথা বলছেন না, আর অবুঝের মতো আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ওয়ার্ডের অন্য মানুষেরা বলছিল মায়ের শিয়রে একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতে। সেদিন সকাল থেকেই মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মা আমাকে কিছু একটা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বলেছিলাম— 'মা, ও মা, তুমি কি জল খাবে?' কিন্তু মুহূর্তেই তাঁর সেই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চিরতরে থেমে গেল। আমি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মা শেষবারের মতো বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আমাকে কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সব শেষ।

আমি তখন নিতান্তই এক চঞ্চল ও অবুঝ শিশু। হাসপাতালের ফ্লোরে মায়ের বেডের নীচে ঘুমাতাম আর জেগে উঠলেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতাম। একদিকে মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে যাওয়া, অন্যদিকে অভিভাবকহীন এক ছন্নছাড়া শৈশব, সব মিলিয়ে এক গভীর শূন্যতায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। ঠিক সেই দিশেহারা মুহূর্তে আমার জীবনে ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হলেন শিলচর ও গুয়াহাটির বিখ্যাত 'দীনদয়াল' ডাক্তার— দিলীপ কুমার সরকার। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মতো তিনি আমার হাতটি শক্ত করে ধরলেন এবং নিজের দুই ছেলের পাশাপাশি আমাকে তৃতীয় সন্তান হিসেবে পরম স্নেহে আপন করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

আজ বড়ো হয়ে যখন পেছনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই, তখন বুঝতে পারি, মা মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো কী বলতে চেয়েছিলেন। হয়তো তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে বলতে চেয়েছিলেন— 'তুই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে থাকবি, তিনি যেমন বলেন তেমনভাবেই চলবি। দুষ্টুমি করবি না, শান্তভাবে তিনি যা বলবেন তাই করবি। আমি তো এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার আশীর্বাদ চিরকাল তোর ওপরে থাকবে। বিদায় অরবিন্দ, বিদায়।'

মায়ের সেই না-বলা কথাগুলো যেন ডাক্তারবাবুর স্নেহের মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল। তিনি আমাকে কেবল আশ্রয় দেননি, দিয়েছেন পিতৃস্নেহ, দিয়েছেন বাঁচার মতো একটি সুন্দর জীবন। আজ তিনি হয়তো সশরীরে আমার মাঝে নেই, কিন্তু আমার প্রতিটি শ্বাসে, আমার প্রতিটি পরিচয়ে তিনি

মিশে আছেন। মানবতার এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আজীবন আমার আকাশের ধ্রুবতারা হয়ে আমার পথ আলোকিত করে রাখবেন।

মায়ের মৃত্যুর পর আমার নিজের মামা-মামিমা (মায়ের আপন ভাই ও ভাইবৌ) মায়ের শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেন। এরপর জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে আমার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে ওঠে ডাক্তার দিলীপ কুমার সরকারের সেই পরম মমতাময়ী গৃহ। তিনি আমার কাছে হয়ে উঠলেন আমার পরম পূজনীয় 'মামা'। মামার একান্ত ইচ্ছে ছিল, আমি যেন পড়াশোনা শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠি। তাঁরই হাত ধরে এক স্থানীয় পাঠশালায় আমার বিদ্যাশিক্ষার হাতেখড়ি হয়। সেখানে আমি শুধু একজন বাবাকেই পাইনি, পেয়েছিলাম এক স্নেহময়ী মাকেও আমার মামিমার মধ্যে— শ্রীমতী শেফালী সরকার। তিনি আমাকে নিজের কোলেপিঠে করে পরম আদরে মানুষ করেছেন। সেই পরিবারে আমি পেয়েছিলাম রক্তের বাঁধনের চেয়েও নিবিড় এক ভাই-বোনের সম্পর্ক— আমার দুই দাদা ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি সরকার ও অ্যাডভোকেট শান্তনু সরকার এবং দিদি ডাঃ ভারতী সরকারকে। পরিবারের সবচেয়ে ছোটো ভাইয়ের মতো তাঁরা আমাকে স্নেহের চাদরে আগলে রেখেছিলেন। শিলচর থেকে শুরু হওয়া আমার এই জীবনের যাত্রা, এরপর মামার হাত ধরেই গুয়াহাটিতে পৌঁছাই। গুয়াহাটি থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে আজ আমি কলকাতাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি। এই যে আমার একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবন— এর প্রতিটি মুহূর্তে মিশে রয়েছে এই পরিবারটির নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

মামার হাত ধরেই আমার জীবনে প্রথম 'সঙ্ঘ' শাখায় যাওয়া শুরু। শৈশবের সেই দিনগুলোতে শাখায় গিয়ে খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম, প্রার্থনা করে আবার বাড়ি ফিরে আসতাম। প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে মামা নিয়ম করে আমার ঘুম ভাঙাতেন। যতক্ষণ না আমি বিছানা ছাড়তাম, তিনি আমার পেছনে লেগেই থাকতেন। সত্যি বলতে, তখন এই ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর লাগত। ভোরের ঘুমটা এমনিতেই খুব আরামদায়ক হয়, আর সেই মিষ্টি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বাইরে যাওয়াটা যেন রীতিমতো শাস্তির মতো মনে হতো। আমার বিরক্তি দেখে মামা শান্ত গলায় বলতেন— 'দেখ, সকালে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সকালের এই সময়টা হলো ঊষাকাল। এই সময়ে দেবতারা পৃথিবীতে আসেন আর ভোরের স্নিগ্ধ বায়ুমণ্ডল শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।' তিনি আরও একটি কথা প্রায়ই বলতেন— 'যে ঘুমায়, তার ভাগ্যও ঘুমায়।'

সেই ছোট্ট বয়সে কথাগুলোর গভীর অর্থ খুব একটা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আজ যখন বড়ো হয়েছি, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করতে পারি, আমার সেই বিরক্তি সত্ত্বেও, প্রতিদিন সকালে জেদ করে আমাকে ঘুম থেকে তুলে শাখায় নিয়ে যাওয়া বা সময়মতো পড়তে বসানোর পেছনে তাঁর কত বড়ো এক অদৃশ্য শাসন এবং অসীম ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল। আজ মনে মনে ভাবি, এই স্বার্থপর পৃথিবীতে কে কার জন্য এত কিছু করে! এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার তো কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে যে আদর, যত্ন ও নিখাদ ভালোবাসায় ভরিয়ে রেখেছিলেন, তা সত্যিই বিরল। রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে যে আত্মার এক পবিত্র সম্পর্ক হয়, তাঁরাই আমাকে সেই পরম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।

তিনি প্রায়ই একটি কথা বলতেন, 'আহার, নিদ্রা, ভয়— যত বাড়ায় তত হয়।' ছোটবেলায় তাঁর এই কথাগুলো শুনে আমার হাসি পেত, নেহাতই হাস্যকর মনে হতো। কিন্তু আজ, জীবনের এই পরিণত পর্যায়ে এসে তাঁর সেই কথাগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকা গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করতে পারি।

সঙ্ঘের শাখার প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়। একবার শাখা থেকে বাড়ি ফেরার পর মামা জানতে চাইলেন, আমার প্রার্থনা কতটুকু মুখস্থ হয়েছে। আমি শুধু প্রথম পঙ্‌ক্তিটি 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে' বলার পরই থমকে গেলাম, আর কিছুই বলতে পারলাম না । শাখায় গিয়ে আমি আসলে কী করছি— সেই প্রশ্নে সেদিন তাঁর কাছে বিস্তর বকা খেয়েছিলাম। আজ সেই সম্পূর্ণ প্রার্থনা আমার কণ্ঠে মুখস্থ। তবে

সেদিন শিশুমন অভিমানে ভেবেছিল, সামান্য একটা প্রার্থনা মুখস্থ না করার জন্য কেউ এভাবে বকে! আজ বুঝতে পারি, সেই বকুনির আড়ালে আসলে কী লুকিয়ে ছিল। তিনি শুধু আমার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করছিলেন না, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন শাখার মাধ্যমে আমার ভেতর কী কী গুণ বা সংস্কার বিকশিত হচ্ছে। কারণ, সঙ্ঘের শাখায় তো কেবল প্রার্থনা বা খেলাধুলাই হয় না; সেখানে শারীরিক চর্চার পাশাপাশি ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কার ও সংস্কৃতির পাঠ দেওয়া হয়। আমি ঠিকমতো সংস্কার পাচ্ছি কি না, কিংবা কোনো কুসঙ্গে জড়াচ্ছি কি না— একজন সতর্ক ও স্নেহশীল অভিভাবকের মতোই তিনি সেদিন সেটাই যাচাই করতে চেয়েছিলেন।

তিনি সবসময় বলতেন— 'শাখায় যাওয়া একজন স্বয়ংসেবক শুধু খেলতেই যায় না , সে খেলতে খেলতেই পেয়ে যায় জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি।'

সত্যিই তো, শাখা আমাদের শেখায় এক পরম সত্য— 'নিজের ওপরে সমাজ, সমাজের ওপরে দেশ।' শাখায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত একজন সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে এক আদর্শ, চরিত্রবান ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। দেশের জন্য বাঁচার, সমাজের কল্যাণে কাজ করার এবং জাতির গৌরব রক্ষার যে অদম্য প্রেরণা একজন স্বয়ংসেবক লাভ করেন, তার পবিত্র সূচনা হয় শাখার সেই খেলাধুলা, প্রার্থনা ও মহামিলনের প্রাঙ্গণ থেকেই। মামার সেই দূরদৃষ্টি সেদিন আমাকে যে পথে চালিত করেছিল, আজ তার প্রতিটি সুফল আমি আমার জীবনে অনুভব করি।

তিনি প্রায়শই স্বামী বিবেকানন্দের সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন— 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' কেবল মুখে আওড়ালে হবে না আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধানের মতো একটি শীর্ষ পদে আসীন থেকেও তিনি ক্ষমতার বা পদমর্যাদার অহংকারে কখনও মাটি থেকে পা সরাননি। তাঁর সেই স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ আর জাদুকরি চিকিৎসায় কত অগণিত মুমূর্ষু যে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন, সেটা হিসেবের বাইরে। গভীর রাতে, যখন চারদিক নিস্তব্ধ, তখন কোনো অসহায় রোগীর খবর এলেই তিনি নিজের আরামের ঘুম তুচ্ছ করে ছুটে যেতেন। কিন্তু সেই অমূল্য সেবার বিনিময়ে একটি কপর্দকও পারিশ্রমিক হিসেবে নিতে তাঁকে কেউ কোনোদিন দেখিনি। এই চরম বাণিজ্যিক যুগে তিনি ছিলেন এক অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম। কোনো রোগীকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে টেস্টের জন্য পাঠালে, সেই সেন্টারগুলো থেকে যখন নিয়মমাফিক 'কমিশন' আসত, মামা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি তাদের সাফ জানিয়ে দিতেন— 'আমার এই টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমাদের যদি সত্যিই কিছু করার সদিচ্ছা থাকে, তবে আমার এই গরিব রোগীদের টেস্টের খরচটা অন্তত কমিয়ে দিও।' একজন নামকরা চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে কোনোদিন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে অর্থ উপার্জন করতে দেখিনি। বরং দেখেছি, নিজের পকেটের কষ্টার্জিত অর্থ হাসিমুখে বিলিয়ে দিয়ে অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ ত্যাগের পেছনে ছিল এক গভীর আধ্যাত্মিক দর্শন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক— যেখানেই যাই না কেন, উপরে গিয়ে যখন পূর্বপুরুষদের মুখোমুখি দাঁড়াব, তাঁরা তো জিজ্ঞেস করবেন— 'কীরে, পৃথিবীতে গিয়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য কী করে এলি? সেদিন যেন মাথা উঁচু করে অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, আমি মানুষের জন্য এই কাজটুকু করে এসেছি।'

এখানে তাঁর জীবনের আরেকটি ঐতিহাসিক ও রোমহর্ষক অধ্যায়ের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থার সেই অন্ধকার দিনগুলোতে, যখন শাসনযন্ত্রের দমন-পীড়নে সারা দেশ থরথর করে কাঁপছে, মামা তখন নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে রাজবন্দি হিসেবে কারাবরণ করেন। সেই দুঃসময়ে আমি আমার মামিমা শ্রীমতী শেফালী সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম এক 'বাঘিনি' রূপ। একদিকে শিক্ষিকা হিসেবে নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালন, আর অন্যদিকে চরম গোপনীয়তার সঙ্গে অসংখ্য আত্মগোপনকারী সঙ্ঘের প্রচারককে নিজের আশ্রয়ে আগলে রাখার মতো দুঃসাহসিক কাজ তিনি দিনের পর দিন করে গেছেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পুলিশি ও প্রশাসনিক অত্যাচার সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের ওপর কী অবর্ণনীয়

মাত্রায় ছিল, তা সেই সময়ের প্রত্যক্ষদর্শীরা আজও শিহরিত হয়ে স্মরণ করেন। কিন্তু এই বিষয়টি উল্লেখের কারণটি হলো এই চরম ত্যাগ, তপস্যা আর কারাবাসের আগুন থেকে পুড়ে মামা বেরিয়ে আসার পরও তাঁর মধ্যে অসাধারণ সেবাকাজের প্রতিফলন দেখেছি। পরবর্তীকালে আমি যখন মামার আঙুল ধরে অসমের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি, তখন দেখেছি সাধারণ মানুষ তাঁকে কী অপরিসীম শ্রদ্ধা আর দেবতার মতো ভক্তি করে। আমি বারবার একটি দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছি, মানুষ তাঁকে কেবল একজন ডাক্তারবাবু হিসেবে নয়, বরং নিজেদের ঘরের সবচেয়ে আপন ও শ্রদ্ধেয় অভিভাবক হিসেবেই বুকে টেনে নিয়েছিল। মামার এই অদ্ভুত আত্মীয়সুলভ ব্যবহার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকঠিন প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং আপাদমস্তক সেবামূলক মনোভাবের কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিরোধী রাজনৈতিক বিচারধারার মানুষ হয়েও অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া মামাকে তাঁর একজন অকৃত্রিম বন্ধু বলে মনে করতেন। আবার অন্যদিকে, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী (যিনি আমার মামিমাকে নিজের স্নেহের বোন বলে সম্বোধন করতেন) থেকে শুরু করে অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সবাই গুয়াহাটিতে মামার বাড়িতে ছুটে এসেছেন তাঁর মূল্যবান পরামর্শ নিতে। এত উচ্চপর্যায়ে, এত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল, তবুও নিজের বা পরিবারের জন্য বিন্দুমাত্র কোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা তাঁকে কোনোদিন গ্রহণ করতে দেখিনি। ক্ষমতার এত কাছাকাছি থেকেও এমন নির্মোহ, নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর মানুষ যেখানে বিশ্রামের আশ্রয় খোঁজে, মামার জীবনে সেখানে শুরু হলো এক নতুন কর্মযজ্ঞ। গুয়াহাটিতে তিনি স্বয়ংসেবকদের তৈরি সংগঠন 'সেবা ভারতী'র সঙ্গে সুবিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করলেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে তিনি রচনা করলেন 'আরোগ্য ভারতী'র জন্য 'আরোগ্য পুস্তক'। ট্রেনের অবিরাম দুলুনিতে, দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তিকে সঙ্গী করে তিনি সেই বিভিন্ন বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। কিন্তু এখানেও তাঁর সেই চিরপরিচিত নির্লিপ্ততা। বই প্রকাশের পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বা লেখক হিসেবে নিজের নামটুকুও তিনি সেখানে ছাপতে দেননি। বলতেন— 'মানুষের কাজ হওয়া নিয়ে কথা, শুধু শুধু নাম দিয়ে কী হবে!

' আজ ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও) সারা দেশজুড়ে যেভাবে এক বিশাল চিকিৎসা পরিষেবা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, কিংবা 'ধন্বন্তরি সেবা যাত্রা', যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো শহরের স্বনামধন্য চিকিৎসকরা নিজেদের আরামের জীবন ছেড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের দুর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে গিয়ে নিঃস্বার্থভাবে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন,তার অন্যতম মূল রূপকার ও স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এই ডাক্তার দিলীপ কুমার সরকার। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কৃষ্ণগোপালজী, উল্লাসজী ও ভাস্করজীর অবিরাম অনুপ্রেরণায় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহৎ সেবাকাজের সূচনা হয়েছিল।

সেই সময় প্রতিদিন মামার ছায়াসঙ্গী হয়ে আমিও সেই সেবাকাজের মাঠে যেতাম। চোখের সামনে দেখতাম, একজন বয়স্ক মানুষ কী অসীম প্রাণশক্তিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, কোথাও রোগীদের জন্য বিনামূল্যের ওষুধের জোগান নিশ্চিত করছেন, তো কোথাও দূর শহর থেকে আসা তরুণ ডাক্তারদের সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করছেন। তাঁর এই প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ আমার জীবনের জন্য ছিল এক-একটি অমূল্য পাঠশালা। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছিল, যখন পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব পাই। গুয়াহাটিতে মামার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শেখা সেই ব্যবহারিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সেবার প্রতি সেই নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে পরবর্তী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পথ দেখিয়েছে। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে যে বীজ আমার অন্তরে বপন করে দিয়েছিলেন, তা আজ এক বিশাল মহীরুহ হয়ে আমার জীবনের প্রতিটি সেবাকার্যে পরম ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

জীবনের পড়ন্ত বেলায়, শারীরিক অসুস্থতার কারণে মামা যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন দীর্ঘসময় তাঁর সেবা করার এক পরম পবিত্র সুযোগ আমার জীবনে এসেছিল। সেই চরম অসুস্থতার দিনগুলোতেও আমি মামার ভেতর এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেখেছি। রোগের কাছে তিনি কখনোই মাথা নত করেননি; তীব্র কষ্টের মাঝেও সর্বদা নিজেকে সুস্থ বলে দাবি করতেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বলতেন— 'আলস্যই হলো শরীরে রোগের আসল বাসা।' বড় দাদা ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি সরকার সেই সময় দিনরাত এক করে, নিজের চিকিৎসাবিদ্যা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে বাবাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। অসুস্থ শরীরেও মামা মাঝে মাঝেই গুনগুন করে গাইতেন— 'হে জন্মভূমি ভারত, হে কর্মভূমি ভারত...।' আমাকে আর দাদাকে পাশে বসিয়ে পরম তৃপ্তিতে সঙ্ঘের প্রার্থনা করতেন।

মামার জীবন থেকেই আমি শিখেছি সততার প্রকৃত অর্থ। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন, ক্ষমতাবান মানুষদের খুব কাছাকাছি থেকেও কীভাবে ক্ষমতার মোহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হয়, কীভাবে সমস্ত অহংকার ত্যাগ করে আজীবন একদম সাধারণ ও মাটির কাছাকাছি থাকা যায়। তিনি যা মুখে বলতেন, তা নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তবেই ক্ষান্ত হতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে, চোখে চোখ রেখে তিনি আইনি লড়াই চালিয়ে গেছেন। অন্যায়কে 'অন্যায়' বলতে তিনি কোনোদিন ভয় পাননি বা এক পা-ও পিছিয়ে আসেননি। তিনি ছিলেন একাধারে 'দীনদয়াল' চিকিৎসক, সমাজের কল্যাণে এক সম্পূর্ণ নিবেদিত প্রাণ। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম, আর 'হিন্দুত্ব' ছিল তাঁর কাছে এক অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা। তিনি কেবল একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন না, আমার কাছে তিনি ছিলেন এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা।

আজ আমি যে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা তাঁরই আশীর্বাদের ফল। তাঁর এই অসীম ঋণ আমি কোনোদিনও শোধ করতে পারব না, তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রণাম মামা! তুমি আজ যেখানেই থাকো, খুব খুব ভালো থেকো। তোমার আলোতেই চিরকাল আলোকিত হয়ে থাক আমার জীবনপথ।